

আল্লাহকে পাইতে পারিবে কি? কখনও না। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কি নবীর তরীকার বিরুদ্ধে কোন কাজ নিজে কখনও করিয়াছেন? বা কোন তরীকতপন্থীকে তিনি ঐরূপ করিতে এজাযৎ দিয়াছেন? কখনো দেন নাই। বিশ্ববিখ্যাত পীরে-কামেল হযরত শায়খ সা'দী (রঃ) বলিয়াছেন :

خلاف پیغمبر کسیں ره گزید که هرگز بمنزل نخواهد رسید

“অর্থাৎ, নবীর তরীকার খেলাফ কোন তরীকা ধরিয়া কেহ কস্মিনকালেও খোদা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে না।” খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীকে অনর্থক তোহ্মত বা অপবাদ দেওয়া ভয়ানক গোনাহের কাজ। তিনি কখনও গান-বাদ্য করিয়া যান নাই। অবশ্য সুন্দর আওয়াজে আল্লাহর কালাম বা ছন্দবদ্ধ কবিতায় আল্লাহ, রাসূলের প্রেমের কথা বা কোন আশেকে রাসূল, আশেকে খোদা বুয়ুর্গের রচিত এশকে রাসূল বা এশকে খোদার কবিতা কোন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের দ্বারা বিনা বাদ্যযন্ত্রে খাছ মজলিসে পড়াইয়া শুনিয়াছেন, তাহাও কোন নফসানী আনন্দ উপভোগের জন্য নহে ব্যবসা বা পেশা আকারে নহে; বরং নিজের ভিতরে আল্লাহর ও রাসূলের এশকের আশুন বাড়াইবার জন্য। হাদীস শরীফে এইরূপ আসিয়াছে যে, ছয়ূরের নিকট দুইজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালিকা দফ বাজাইয়াছিল ও তাহারা সুর দিয়া কবিতা পাঠ করিয়াছিল বা গান গাইয়াছিল, তাহা আমাদের নবী করীম (দঃ) আদৌ নিষেধ করেন নাই; বরং তিনি তাহা নীরবে শুনিয়াছিলেন। এই হাদীসের দ্বারা যাহারা গান-বাদ্য জায়েয হওয়ার দলীল গ্রহণ করে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে নবীর তরীকা গ্রহণ করে না; বরং তাহারা নফসের খাহেশের কারণে হিন্দুর তরীকা ও প্রচলিত প্রথাকে গ্রহণ করিয়াছে; আর এখন শুধু জিদ বা হঠকারিতার কারণেই হাদীসের বাহানা করে। কারণ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের জন্য কিছু পরিমাণ পবিত্র আমোদ-প্রমোদ স্ফুর্তি বা খেলাধুলা জায়েয রাখা হইয়াছে। ইহাও সেই পর্যায়ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ দফ—বন্ধ ঢোল বা তবলাকে বলে না। দফ বলে সেই ঢোলকে যার পিছনের দিক বন্ধ নয়— একেবারেই খোলা। যেমন আমাদের ছেলেমেয়েরা বকরা ঈদের সময় গরুর ঝিল্লিপর্দাকে ভাংগা কলসী বা ঘড়ার মুখে লাগাইয়া বাজাইয়া থাকে। ইহার দ্বারা ঢোল বাজান, করতাল বাজান, বাঁশী বাজান, দোতার, সেতার, সারাসঙ্গ, বেহালা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাজান কিছুতেই প্রমাণিত হইতে পারে না। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের এতটুকু গান-বাদ্যও যখন মাত্রায় কিছু বেশী হইয়া গেল এবং হযরত ওমর যখন ঐ মজলিসে আসিলেন, তখন মেয়েরা সব গান-বাদ্য ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। হযরত নবী আলাইহিস্সালাম তখন বলিলেন, “হে ওমর!” আপনাকে দেখিয়া শয়তান পলায়। আপনি যে গলি দিয়া হাঁটেন, শয়তান সে গলিতে যাইতেও ভয় পায়। যদি গান বাদ্য পছন্দনীয় কাজ হইত, তবে এই কাজকে নবী আলাইহিস্সালাম শয়তানী কাজ বলিলেন কেন? প্রিয় পাঠক! নফসের খাহেশের পায়রবী ছাড়িয়া চিন্তা করিয়া নবীর তরীকা ধরিয়া চলুন; অন্য মানুষের অন্ধ অনুকরণ ছাড়ুন। নিম্নে উক্ত পূর্ণ হাদীসটি উদ্ধৃত করা গেল।

حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَعَاذِرِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ رَدَّكَ اللَّهُ صَالِحًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالْأُذُنِ وَأَتَعْنَى فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كُنْتَ نَذَرْتَ فَأَضْرِبِي وَإِلَّا فَلَا فَجَعَلْتُ تُضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ (رضى) وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ (رضى) فَأَلْقَتِ الدَّفَّ تَحْتَ إِسْتِهَاتِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ فَلَمَّا دَخَلَتْ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتِ الدَّفَّ -

(رواه الترمذی)

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّضًا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقَيْكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ - (متفق عليه)

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَنْظُرُ شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ قَدَفَرُوا مِنْ عُمَرَ - (رواه ترمذی)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ (وَالْجَارِيَةُ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ لَمْ تَبْلُغِ الْحُلُمَ) مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغْنِيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بَعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتْ بِمُغْنِيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمْزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عَيْدِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عَيْدًا وَهَذَا عَيْدُنَا - (بخارى شريف) صفحہ ۱۲۰ - ج ۱

এই হাদীসের মর্মার্থ—একবার হযরত নবী (আঃ) জেহাদে গিয়াছিলেন। জেহাদ হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার নিকট একটি অপ্ৰাপ্ত বয়স্কা বালিকা আসিয়া বলিল; হুয়ূর! আমি মান্নত মানিয়াছিলাম, আল্লাহ্ যদি আপনাকে ছইহু সালামতে ফিরাইয়া আনেন, তবে আমি খুশীতে আপনার সামনে দফ বাজাইয়া এবং গীতগাহিয়া আনন্দ প্রকাশ করিব। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন; আচ্ছা যদি তুমি মান্নত মানিয়াই থাক, তবে তুমি দফ বাজাও। যদি মান্নত না মানিয়া থাক, তবে বাজাইও না। বালিকাটি দফ বাজাইতে লাগিল। তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) আসিলেন—তখনও সে দফ বাজাইতেছিল। তারপর হযরত আলী (রাঃ) আসিলেন, তখনও সে দফ বাজাইতেছিল। তারপর হযরত ওসমান (রাঃ) আসিলেন, তখনও সে দফ বাজাইতেছিল। তারপর যখন হযরত ওমর (রাঃ) আসিলেন, তখন ঐ বালিকাটি ভয়ে দফ বাজান ছাড়িয়া দিয়া তাড়াতাড়ি দফটি লুকাইবার জন্য উহা তাহার পাছার তলে রাখিয়া উহার উপর বসিয়া পড়িল। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন; ‘হে ওমর! শয়তান আপনাকে বড়ই ভয় করে। আমি বসিয়াছিলাম, তখনও সে বালিকাটি দফ বাজাইতেছিল; তারপর আবু বকর আসিলেন তখনও সে দফ বাজাইতেছিল; তারপর আলী আসিলেন, তখনও সে উহা বাজাইতেছিল; তারপর ওসমান (গণী) আসিলেন, তখনও সে দফ বাজাইতেছিল। কিন্তু যখন আপনি আসিলেন, হে ওমর! তখন সে আর দফ বাজাইতে সাহস করে নাই। তখন সে দফ ফেলিয়া দিয়াছে।—তিরমিযী শরীফ। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হযরত ওমর সম্পর্কে আরও বলিয়াছেন; হে ইবনে খাত্তাব! আমি খোদার কসম করিয়া বলিতেছি, শয়তান আপনাকে এত ভয় করে যে, আপনাকে যদি সে একটা রাস্তা দিয়া যাইতে দেখে, তবে সে ঐ রাস্তায় আসিতেও সাহস পায় না! সে অন্য

রাস্তার দিকে চলিয়া যায়। (বোখারী ও মুসলিম।) হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন; 'হে ওমর! আমি দেখি যে, মানুষ শয়তান এবং জ্বিন শয়তান উভয়ে আপনাকে দেখিলে ভাগিয়া পালায়'। এই হাদীসের দ্বারা ইহাই বুঝা গেল যে, নাবালেগ ছেলে-মেয়েদের দফ্ বাজান এবং গীত গাওয়া যদিও হারাম নহে, কিন্তু কাজটা শয়তানী কাজ। অন্য হাদীসে আছে; আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক দিন আমি আমার বাড়ীতে ছিলাম; আমার আব্বা হযরত আবুবকর আসিয়া দেখিলেন, দুইটি বালিকা গীত গাহিতেছে। তাহারা অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকা ছিল এবং গায়িকাও ছিল না। বিনা শিক্ষায় বিনা সুরশিল্প চর্চায় স্বাভাবিকভাবে তাহারা গীত গাহিতেছিল। আমি তাহাদিগকে মানা করিতেছিলাম না এবং হযরত রাসুলুল্লাহ্ (দঃ)-ও তাহাদিগকে মানা করিতেছিলেন না। কিন্তু আমার আব্বা হযরত আবুবকর রাসুলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ঘরে গীত গাহিতে দেখিয়া খুব রাগান্বিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, রাসুলুল্লাহ্‌র ঘর আর শয়তানের গীত! বালিকাদ্বয়ের গীতের বিষয়বস্তু কি ছিল? আউস ও খায়রাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত সর্বনাশা বুআস নামক যুদ্ধের দিন আনছারগণ যেসব বীরত্ব ব্যঞ্জক কবিতা গাহিয়া স্ব স্ব দলের যুদ্ধোৎসাহনা বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহাদের গীতের বিষয়বস্তু ছিল তাহাই। গীতের সময়টা ছিল ঈদের দিন। রাসুলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ হে আবুবকর! প্রত্যেক জাতির একটা খুশীর দিন থাকে। এটা আমাদের ঈদের খুশীর দিন। তাই এইরূপ খুশীর দিনে, ঈদ বা বিবাহের দিনে ছোট বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের কিছু খুশী করিতে দেওয়া উচিত। এই হাদীস দুইটি খুবই প্রশিধানযোগ্য।

কোন কোন তথাকথিত ছুফী নামধারী লোক এই দুইটি হাদীসের দ্বারা তাহাদের নফসানী খাহেশে গান-বাদ্য নর্তন-কূর্দন ইত্যাদি জায়েয প্রমাণ করিতে চাহেন। অধিকন্তু তাঁহারা অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে ইহাও বলিয়া থাকেন যে, চিশতিয়া তরীকায় গান-বাদ্য জায়েয আছে। এইরূপ উক্তি করা তাঁহাদের শুধু মূর্খতাই নহে, অধিকন্তু ইহা তাঁহাদের নির্লজ্জতা এবং ধৃষ্টতারও পরিচায়ক। কারণ, অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাদের কাজ বয়স্কদের জন্য কোন দলিল হইতে পারে কি? অধিকন্তু যে কাজকে রাসুলুল্লাহ্‌র সামনে হযরত আবুবকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) দুই প্রধান ও প্রথম খলীফাদ্বয় শয়তানী কাজ বলিলেন, অথচ হযরত রাসুলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহাদের কথা রদ করিলেন না; সেই কাজ কোন ছুফী দরবেশের কাজ হইতে পারে কি? হযরত রাসুলুল্লাহ্ (দঃ) নিজে শওক করিয়া কাহারও দ্বারা গান গাওয়াইয়া বা বাদ্য বাজাইয়া সারা জীবনে কখনও শুনিয়াছেন কি? খোলাফায়ে রাশেদীন কখনও গীত বা বাদ্য শুনিয়াছেন কি? তরীকতের পীরগণ—যেমন, খাজা মুঈন্‌দীন চিশতী (রাঃ) কখনও গান গাওয়াইয়া বা বাদ্য বাজাইয়া শুনিয়াছেন কি? কেহ ইহা প্রমাণ করিতে পারিবে কি? কস্মিনকালেও নয়। অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রথম হাদীসে উল্লিখিত ঘটনায় বালিকাটিকে দফ্ বাজাইতে এজায়ত দেওয়া হইল কেন এবং দ্বিতীয় হাদীসেই বা নিষেধ করেন নাই কেন? আবার শেষ ভাগে তিনি একথা বলিলেন কেন যে, এইটা আমাদের ঈদের দিন, খুশীর দিন? একথার তাৎপর্য এখন শুনুনঃ—দুনিয়াতে যত কাজ আছে, তাহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইতে পারে;—(১) অবশ্য করণীয়—যেমন নামায, রোযা, যাকাত, সতীত্বরক্ষণ, চরিত্রসংরক্ষণ, দুর্নীতি দূরীকরণ, লোকসেবা, পরোপকার ইত্যাদি। ইহাকে ফরয বা ওয়াজিব বলা হয়। এই প্রকারের কাজ ব্যক্তিগতভাবেও করিতে হইবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে পক্ষ হইতেও জারি করার জন্য প্রয়াস পাইতে হইবে। (২) দ্বিতীয় প্রকার হইতেছে পছন্দনীয় কাজ, ইহাকে মুস্তাহাব বলে। এই ধরনের কাজ ব্যক্তিগতভাবে এইরূপে করিতে হইবে, যাহাতে

অন্য কোন ফরয কাজ তরক না হয়। কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কোন বাধ্যবাধকতা অরোপ করা যাইবে না, যেমন নফল এবাদত-বন্দেগী। (৩) তৃতীয় প্রকারের কাজ যাহা অবশ্য বর্জনীয় হারাম। এই ধরনের কাজ ব্যক্তিগতভাবেও বর্জন করিতে হইবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষ হইতেও বর্জন করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যেমন, সুদ, ঘুষ, জুয়া, চুরি, ডাকাতি, মানুষ খুন, যুবক-যুবতীদের অবাধ সহ-মিলন, সতীত্ব হরণ, যুল্ম অত্যাচার ইত্যাদি। (৪) চতুর্থ প্রকারের কাজ, যাহা বর্জন করার জন্য স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা নাই বটে, কিন্তু কোরআন হাদীসের ইশারা ইংগিতে বুঝা যায় যে, উহা বর্জন করাই আল্লাহ ও রাসূলের নিকট অধিক পছন্দনীয়; ইহাকে মকরাহ বলে। (৫) পঞ্চম প্রকারের কাজ, যাহা মানুষের মনের মধ্যে আপনাপন স্বভাবগত ভাবেই উৎপন্ন হয়। এরূপ কাজ এক সীমা পর্যন্ত সহনীয় হয়, কিন্তু নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে তাহাও বর্জনীয় এবং উহাকে নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালক-বালিকাদের খুব ভালবাসিতেন। তাহাদের কোমল মনে তিনি কখনও ব্যথা দিতে চাহিতেন না। এই জন্যই তিনি প্রথম অবস্থায় অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাদিগকে বীরত্বব্যঞ্জক গীত গাহিতে বা দফ বাজাইতে নিষেধ করেন নাই। বিশেষতঃ রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ছহীহ সালামতে ফিরিয়া আসিবার জন্য যে বালিকাটি মান্নত মানিয়াছিল, তাহার মনে আবেগ কতদূর প্রবল ছিল! এত প্রবল আবেগকে বাধা দেওয়া যাইতে পারে শুধু তখন যখন কোন পরিষ্কার হারাম বা বর্জনীয় কাজ করিতে চাওয়া হয়, নতুবা সহনীয় কাজের বেলায় এত প্রবল আবেগকে বাধা দেওয়া সমীচীন হয় না। ঠিক এরূপে ঈদের খুশীর দিনেও শাদীর খুশীর দিনেও সীমার ভিতরকার সহনীয় কাজে বালক-বালিকাদিগকে বাধা দেওয়া উচিত নহে। অবশ্য ইহা শুধু অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালক-বালিকাদের জন্য, পূর্ণবয়স্ক পুরুষ লোকদের জন্য বা স্ত্রীলোকদের জন্য নহে। এইরূপে অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাদিগকে যে বাদ্য-যন্ত্রের এজাযত দেওয়া হইবে, তাহাও শুধুমাত্র দফের জন্য দেওয়া যাইবে; অন্য কোন বাদ্য-যন্ত্রের এজাযত কিছুতেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না এবং গীতের বিষয়বস্তুও বীরত্বমূলক বা ঈমান, ইসলাম ও নৈতিক চরিত্র গঠনমূলক হইতে হইবে—ফাসেকী, অবৈধ-প্রেমমূলক, পরনিন্দামূলক বা শিরকমূলক হইলে তাহার এজাযত কিছুতেই দেওয়া হইবে না।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সহনীয় বিষয়গুলি শিল্প হিসাবে চর্চা বা ইহার জন্য সময় ও সম্পদ নষ্ট করা কিছুতেই সহনীয় হইবে না। ষ্টেটের বায়তুল মালের পয়সাও ইহার জন্য খরচ করার এজাযত হইবে না। অবশ্য আপনাপন ছেলেপিলেরা তাহাদের মনের স্ফুর্তির জন্য বা শরীরের কসরতে জন্য কিছু সময় পরিমাণ কিছু চর্চা করিলে তাহাতে বাধা দেওয়া উচিত হইবে না; তবে সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে বাধা দিতে হইবে। হযরত রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন শরীফ পড়াইয়া শুনিয়াছেন, ভাল কবিতা পুরুষ লোকের দ্বারা পড়াইয়া শুনিয়াছেন। হাতিয়ার লইয়া যুদ্ধ চর্চা বা দৌড়াইয়া পরিমিত পরিমাণ শরীর চর্চা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কাজের ভিতর দিয়া শরীর চর্চা করিয়াছেন। ছাড়াবায়ের কেরামগণও তদ্রূপ করিয়াছেন। এতটুকু ছাড়া কস্মিনকালেও তাঁহারা শওক করিয়া গান-বাদ্য শুনেন নাই বা খেলাধুলা ও ক্রীড়াকৌতুকে অযথা সময় বা সম্পদ নষ্ট করেন নাই। অতএব, যাহারা মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে বা যাহারা ছুফী দরবেশ, তাহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা এবং ছাড়াবাগণের তরীকার সীমা ছাড়াইয়া যাওয়া কিছুতেই উচিত হইবে না।

## কুকুর পালা এবং ছবি রাখা

খৃষ্টান ধর্মে বা হিন্দু ধর্মে কুকুর পালায় বা ছবি (মূর্তি ও ফটো) রাখায় কোন নিষেধাজ্ঞা নাই। খৃষ্টানদের প্রভাবে যাহারা প্রভাবিত হইয়াছে তাহারা খৃষ্টানদের অনুকরণ করিয়া কুকুর পালা এবং ছবি রাখা শুরু করিয়াছেন। সেই দেখাদেখি ধর্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ কিছুসংখ্যক মুসলমানও ছবি রাখা এবং কুকুর পালা শুরু করিয়াছেন। অথচ আমাদের প্রাণপ্রিয় পয়গম্বর আলাইহিসসালাম অত্যন্ত তাকীদের সহিত কুকুর পালিতে এবং ছবি রাখিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। যাহারা মুসলমান নাম ধারণ করা সত্ত্বেও নবীর আদেশ পালন না করিয়া অন্য মিথ্যা ও ভুল ধর্মের অনুকরণ করে, তাহাদের চেয়ে হতভাগা ইহ-পরকালে আর নাই। হযরত নবী (আঃ) বলিয়াছেন, যে বাড়ীতে বা যে ঘরে কুকুর থাকিবে অথবা ছবি থাকিবে, সে ঘর এবং সে বাড়ী হইতে আল্লাহর রহমতের খাছ ফেরেশতা চলিয়া যাইবে। বোখারী শরীফে হযরত নবী আলাইহিসসালাম আরও বলিয়াছেন। সবচেয়ে বেশী আযাব তাহাদের হইবে, যাহারা ছবি (মূর্তি বা ফটো) বানাইবে।

নবী আলাইহিসসালাম বলিয়াছেনঃ (১) শিকার ধরিবার উদ্দেশ্যে, (২) বকরী পাহারার উদ্দেশ্যে, (৩) আখ ইত্যাদি কৃষিক্ষেত্রে পাহারার উদ্দেশ্যে, এই তিনটি উদ্দেশ্যে ব্যতিরেকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে যে কেহ কুকুর পালিবে, দৈনিক তাহার নেকী হইতে এক এক কীরাত কম হইতে থাকিবে (বোখারী শরীফ)। অন্য হাদীসে আছে, এক কীরাত ওছদ পাহাড়ের সমান।

এইসব হাদীসের দ্বারা ছবি রাখা এবং কুকুর পালা হারাম প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব, শিশুদের খেলনারূপেও রবারের মূর্তি অথবা মাটি, পাথর বা কাঠের পুতুল ব্যবহার করা ও ঘরে রাখা না-জায়েয। কোন কোন ছেলের কুকুরের বাচ্চা পালার শওক হয়। কিন্তু কিছুতেই মুরবিবদের এই শওক পুরা করা চাই না।

ছবি ফটো চার প্রকার হইয়া থাকেঃ—(১) প্রথম প্রকার যাহাকে ভক্তি করা হয়। যেমন, কোন দেব-দেবীর ছবি বা কোন পীর-পয়গম্বরের ছবি, কোন মন্দিরের ছবি বা কোন ক্রুশ কাঠের ছবি; ইহা সবচাইতে বড় গোনাহ্। (২) দ্বিতীয়—কোন সুন্দরী নারীর ছবি, যাহা দেখিলে পুরুষের উত্তেজনা বাড়ে, ইহাতে দ্বিগুণ গোনাহ্। (৩) তৃতীয়—সাধারণ ছবি যাহাতে কোন উত্তেজনা নাই, ইহাতে এক গোনাহ্। (৪) চতুর্থ—নির্জীব পদার্থের ছবি। কোন মিথ্যা ধর্মের ধর্মীয় চিহ্ন না হইলে, সেরূপ নির্জীব পদার্থের ছবি আঁকাতে বা রাখাতে কোন গোনাহ্ নাই। কুকুর এতই অপবিত্র জিনিস যে, কুকুর যদি পাত্রে মুখ দেয়, তবে সে পাত্রকে সাতবার পানি দিয়া ও একবার মাটি দিয়া ধৌত করার লুকুম হাদীস শরীফে আসিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—ধর্মজ্ঞান না থাকার কারণে অনেকে এহেন না-পাক জিনিসকে ঘরে স্থান দেয়।

## মানুষের শরীরের ১০টি সূন্যতে আশ্বিয়া

মানুষের শরীরের মধ্যে ১০টি প্রধান ইসলামী সূন্যত (আদর্শ) আছে। এই সূন্যতগুলি হযরত ইব্রাহীম আলাইহিসসালাম হইতে শুরু করিয়া সমস্ত নবীরই সূন্যত। কিন্তু যখন ইঞ্জিল-তৌরাতকে

দুষ্ট লোকেরা বিকৃত করিয়াছে, তখন হইতে এই সুন্নতগুলিকেও তাহারা বাদ দিয়াছে। দুঃখের বিষয়, খৃষ্টানী প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া কিছুসংখ্যক মুসলিম নামধারী অজ্ঞ যুবকও (নেহাত অল্প বুদ্ধিবশতঃ) খৃষ্টানী সভ্যতা বনাম বর্বরতার অন্ধ অনুকরণ করিয়া, দুনিয়াতে নিজেদের দুর্বলতার পরিচয় দিতেছে। এবং আখেরাত বরবাদ করিতেছে। উক্ত ১০টি সুন্নত, যথা—“খাৎনা” অন্য পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের শরীঅতে মোহাম্মদীয়াতে এই ১০টি আদর্শত আছেই, তদুপরি আরো দুইটি ফরয আদর্শ বর্ধিত করা হইয়াছে। তাহার প্রথমটি হইতেছে, শরীর হইতে পেশাব-পায়খানা, রক্ত পুঁজ-পিস্ত, উল্টা বাতাস ইত্যাদি বাহির হইলে অথবা শরীর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলে তখন ওয়ু করিয়া পবিত্রতা হাছিল করিতে হইবে। আর দ্বিতীয়টি হইতেছে, স্বামী-স্ত্রীর মিলন বা স্বপ্নদোষ হইলে অথবা স্ত্রীলোকের রক্তশ্রাব শেষ হইলে ফরয গোসল করিয়া পবিত্রতা হাছিল করিতে হইবে।

খৃষ্টান প্রভাবে প্রভাবিত বা কোন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ইসলামী শিক্ষা হইতে বঞ্চিত লোক এই আদর্শগুলিকে ধর্মের অংগ মনে করে না। ইহা তাহাদের অজ্ঞতা বা পরানুকরণের হঠকারিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে যেহেতু এই কাজগুলির প্রত্যেকটি কাজই নবী কর্তৃক ওহী দ্বারা শুধু যে প্রেরিত তাহাই নহে; বরং ইহা করার জন্য আদেশও করা হইয়াছে। সুতরাং উহাদের প্রত্যেকটি কাজই ধর্মের ফরয অংগ এবং রহানিয়াত বা আত্মিক শক্তির পরিবর্ধক।

### সংযম অভ্যাসের দ্বিতীয় স্তর

সংযম অভ্যাসের দ্বারাই মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়; নতুবা মানুষ যদি সংযম অভ্যাস না করে, তবে মানুষ ইতর প্রাণী হইতেও অধম হইয়া যায়। বাল্যকালে লোভ রিপু প্রবল থাকে যাহা খাইতে মনে চায় তার সবকিছুই খাইতে দেওয়া হয় না। হারাম জিনিস হইতে মনকে ফিরাইয়া রাখিতে হয়, ক্রোধ রিপু বাল্যকালেও কিছু থাকে; যৌবনকালে উহা আরও বাড়ে। কিন্তু তাই বলিয়া যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই গালি দেওয়া বা মারপিট করা যায় না; বরং উহা না করার জন্য মনকে চাপিয়া বাধ্য করিতে হইবে। যৌবনের প্রারম্ভে আর একটি সর্বনাশা রিপু—অর্থাৎ কাম রিপু দেখা দেয়। তাহা হইতে কিভাবে সংযমের অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা আমরা পূর্বে ‘সংযম অভ্যাস’ পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছে। এরপর দেখা দেয়, মানুষের মধ্যে অহঙ্কার, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা রিপু। মহত্ব হাছিল করিতে হইলে মানুষের এই রিপুগুলিকে অবশ্য জয় করিতে হইবে এবং তারপর মোহ রিপুকে অর্থাৎ, খোদা ও আখেরাতকে ভুলিয়া দুনিয়ার মোহে মত্ত হইয়া থাকার ভাবকেও জয় করিতে হইবে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে জড় বিজ্ঞানের শিক্ষা ত প্রচুর পরিমাণেই আছে, কিন্তু মনুষ্যত্ব শিক্ষা বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা মোটেই নাই, এবং এজন্যই বিজ্ঞানের উন্নতিও টিকিয়া থাকিতে পারিতেছে না। অবস্থা দৃষ্টে ইহাই মনে হইতেছে যে, হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি হইয়া একদিন বিজ্ঞানও হয়ত শেষ হইয়া যাইবে। অথচ জড় বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্ব এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষাও যদি দেওয়া হইত, তবে মানুষ ইহকাল এবং পরকাল উভয় কালেরই উন্নতি করিতে পারিত এবং সে উন্নতি স্থায়ীও হইত।

আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমানে যদিও আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, কিন্তু এখনও আমরা স্বাধীন শিক্ষা ব্যবস্থা ষোলআনা চালু করিতে পারি নাই। এখনও পাশ্চাত্যের অন্ধ

অনুকরণের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। এখনো আমরা জড় বিজ্ঞানের এবং আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় সাধন করার এবং কোরআন ও সুন্নার আলোকে বিজ্ঞানের রিসার্চ করার মত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারি নাই।

### তাস-পাশা ইত্যাদি খেলা

প্রত্যেক পাপই মানুষের মধ্যে ছোট আকারে প্রবেশ করে, তারপর ক্রমশঃ উহা বড় হয়। ছোট বেলায় ছেলেরা হয়ত সামান্য বরই বা কুল চুরি করে; কিন্তু মা-বাপ মুরুব্বিয়ান তখনই যদি শক্তভাবে বাধা না দেয়, তবে শেষে হয়ত এই ছেলেরা একদিন সিদকাটা চোরে (বা ডাকাতে) পরিণত হইবে। এইরূপ আমাদের দেশে তাস-পাশা, কেলামবোর্ড, ফ্লাস, লটারী, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি খেলার প্রথা চালু হইয়াছে। এইসব খেলার ভিতর যদি বাজী রাখা হয়, তবে ত তাহা একেবারেই হারাম হইবে। আর যদি সেরূপ নাও হয়, তবুও মকরুহ তাহরীমা হইবে। কেননা, এইরূপ খেলার মধ্যে এত নেশা হয় যে, সময় কোথা দিয়া কত নষ্ট হইয়া যায় তাহার পাত্তাও থাকে না; এমন কি অনেক সময় নামাযেরও খেয়াল থাকে না। ঘুড়ি উড়ানোর বাতিকও এই পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা, উপরোক্ত সর্ববিধ ক্ষতি ইহাতেও বিদ্যমান। বিশেষতঃ ঘুড়ি উড়ানোর মগ্নাবস্থায় অনেক ছেলেকে ছাদ হইতে পড়িয়া প্রাণ হারাইতেও দেখা যায়। অতএব, যাহারা সমাজের মুরুব্বি তাহাদের এই ধরনের খেলা যাহাতে চালু না হইতে পারে, সেজন্য চেষ্টা করা দরকার। মানুষের জীবনের সময় অতি মূল্যবান সম্পদ, খেলা-ধুলায় এই সম্পদ নষ্ট করা নিতান্ত অন্যায্য।

### ফুটবল খেলা

ফুটবল খেলা বা ক্রিকেট খেলা আসল খেলা নয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক জিনিসেরই একটা সীমা আছে। সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে ভাল জিনিসও মন্দ হইয়া যায়। যদি অতিরিক্ত সময় নষ্ট, পয়সা নষ্ট বা কাজ নষ্ট হয়, যদি নামায কাযা না হয়, সতর না খোলে, কুসংসর্গে মেশা না হয়, তবে ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা শরীঅত অনুযায়ী মোবাহ থাকিবে। অতএব, যদি কেহ উপরোক্ত দোষগুলি এড়াইয়া শরীরের ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে উহা খেলে, তবে তাহা না-জায়েয হইবে না। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, খানার মধ্যে যেমন লবণ খুবই ভাল এবং প্রয়োজনীয় জিনিস, কিন্তু উহা অতিরিক্ত হইয়া গেলে খানা অখাদ্য হইয়া যায়। তেমনি মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ব্যায়াম নেমকের তুল্য। অতএব, ২৪ ঘন্টার মধ্যে এক দেড় ঘন্টার অতিরিক্ত ব্যায়াম হওয়া উচিত নহে। ব্যায়ামও যদি এমন খেলার ভিতর দিয়া হাছিল করা যায় যদ্বারা বীরত্ব বা সাহস বাড়ে অথবা তদুপায়ে কিছু কিছু রোযগারের উপায়ও হয়, তবে সেইটা আরও ভাল। ন্যাযের কাজ বা ধর্মের কাজে লিপ্ত না হইয়া, খেলার মধ্যে বৃথা সময় নষ্ট করা অতীব অন্যায্য—কাজেই উহা বড় পাপ।

### আতশবাজি

আতশবাজির কুপ্রথা সম্ভবতঃ হিন্দুদের অনুকরণেই মুসলমান সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণতঃ শবে-বরাতে বা শাদী-বিবাহের সময় আতশবাজি ফুটান হইয়া থাকে। ইহার অপকারিতা

এই যে, ইহাতে অনর্থক পয়সা অপব্যয় হয়। অথচ অযথা পয়সা অপব্যয়কারীদিগকে আল্লাহ পাক কোরআন শরীফের মধ্যে শয়তানের ভাই বলিয়া অখ্যায়িত করিয়াছেন। দ্বিতীয় আয়াতে বলিয়াছেন : অযথা পয়সা অপব্যয়কারীদের আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন না। এতদ্ব্যতীত অনেক সময় আতশবাজি বা উহার আশুন নিয়া খেলা করাতে ছেলেমেয়েদের কাপড়-চোপড় বা গায়ে আশুন ধরিয়া যায় ; এমন কি অনেক সময় বাড়িতেও আশুন লাগিয়া যায়। ইহাতে মানুষও অনেক মারা যায়। অতএব, এরূপ অপকারী কুপ্রথাকে বর্জন করা দরকার। ছেলেমেয়েদিগকেও এসমস্ত খারাপ কাজে পয়সা অপব্যয় করিতে দেওয়া শরীঅত বিরুদ্ধ।

### মাথায় টিকি রাখা ও মাথার সামনের চুল লম্বা রাখা

মাথায় টিকি রাখা হিন্দুদের প্রথা! টিকি রাখা ত অত্যন্ত জঘন্য কাজ। কিছুদিন হইল খৃষ্টান ইংরেজদের দেখাদেখি অনেকে মাথার পিছনের দিকের চুল খুব খাট করিয়া সামনের দিকের চুল অনেক লম্বা করিয়া রাখে। এই প্রথাও যেহেতু বিধর্মীদের অনুকরণে আমাদের সমাজে ঢুকিয়াছে কাজেই ইহা ঘৃণ্য এবং বর্জনীয়। ছোট বালকদের মাথার চুল ত মুণ্ডাইয়া ফেলাই ভালো। এ ছাড়া পুরুষদের মাথার চুলও মুণ্ডাইয়া ফেলা জায়েয আছে। আগে পাছে সমান করিয়া ছাটিয়া রাখাও জায়েয আছে। আর যদি কেহ কান পর্যন্ত বা কাঁধ পর্যন্ত লম্বা করিয়া রাখে, তবে তাহাও জায়েয আছে ; বরং ইহাতে যদি ফখর বা রিয়াকারী না থাকিয়া সুন্নত পালনের নিয়ত থাকে, তবে সুন্নতের সওয়াবও পাইতে পারে। স্ত্রীলোকের মাথার চুল কাটিয়া খাট করিয়া রাখা খৃষ্টানদের অনুকরণ। আর ঐ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিজাতীয় অনুকরণের পরিণাম অত্যন্ত ভয়ানক। অতএব, এই জঘন্য প্রথা হইতে বাঁচিয়া থাকা একান্ত আবশ্যিক।

স্ত্রীলোকদের মাথার চুল লম্বা করিয়া রাখা উচিত। স্ত্রীলোকদের মাথার চুল অন্য পুরুষদের দেখাও হারাম। এই বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হইতে হইবে।

### বিবাহ সম্পর্কে

অন্যান্য জাতি বা অন্যান্য ধর্মের মধ্যে অনেক পুরাতন প্রথাই উহার পুরাতনত্বের দরুন ঐ জাতির সভ্যতার বা ঐ ধর্মের অংগে পরিণত হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে আধুনিক যুগে কোন প্রথার আধুনিকতাকেই সেই প্রথাকে গ্রহণযোগ্য বলিয়া প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট বলিয়া ধরা হইতেছে। আবার আর একদল যুক্তিবাদীদের নিকট কোন প্রথার যৌক্তিকতাই উহাদের ধর্মের অংগ হওয়ার জন্য যথেষ্ট বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু ইসলাম ধর্ম এত মজবুত যে, এখানে পুরাতনত্বের কোন দোহাইও চলে না, আধুনিকতার কোন যুক্তিও চলে না, আর নিছক যৌক্তিকতার কোন বুলিও গৃহীত হইতে পারে না। ইসলাম চায় কি ? এবাদত বন্দেগীর অনুষ্ঠানই হউক, সভ্যতার কোন বিষয় হউক, কিংবা হালাল-হারাম, পাক-নাপাকের কোন মাসআলাই হউক, চাই চরিত্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোন বিষয়ই হউক—সর্বক্ষেত্রেই যতক্ষণ না কোরআন হাদীসের মাধ্যমে আল্লাহ-রাসূলের সাক্ষ্যের সনদ পাওয়া যাইবে, সে পর্যন্ত উহাকে কিছুতেই ইসলামের অঙ্গীভূত বলিয়া মানা যায় নাই এবং কস্মিনকালে যাইবেও না। কারণ, ইসলাম ধর্ম মানুষের মনগড়া ধর্ম নহে। ইহা নিছক আল্লাহর প্রেরিত ও রাসূলের প্রবর্তিত ধর্ম। ইহাতে রাজা-বাদশাহ বা মাওলানা-মৌলবীদের আদৌ কোন দখল নাই। মৌলবী-মাওলানাদের কৃতিত্ব শুধু এতটুকু যে, তাহারা



দুনিয়ার আয়েশ-আরামকে বিসর্জন দিয়া, জানমাল কোরবান করিয়া আসল আরবী ভাষায় কোরআন-হাদীসের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিবার জন্য হাজার কষ্ট সহ্য করিয়া নিজেদের জীবনকে তদনুযায়ী গঠন করিতে এবং সমাজকে তদনুযায়ী হেদায়ত করিতে ক্রটি করেন না।

যুক্তি দুমুখে জিনিস। ইহা এদিকও চলিতে পারে ওদিকও চলিতে পারে। বহু পুরাতন প্রথাও এমন থাকিতে পারে যাহা আল্লাহর নিকট কিছুতেই পছন্দনীয় হইতে পারে না। আর আধুনিকতা বা যুগের চাহিদার ত কোন অর্থই হইতে পারে না। কারণ যুগের কোন চাহিদাই নাই—চাহিদা হয় মানুষের মনের। আর মানুষের মনকে সর্বদাই রাখিতে হইবে আল্লাহর তাবেদার করিয়া। নতুবা মনকে যদি স্বেচ্ছাচারী করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে মানুষের মুক্তি বা মানুষের উন্নতি সুদূর পরাহত।

পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি ইতর প্রাণীর মধ্যে বিবাহ বন্ধনের প্রথা নাই। কিন্তু মানব জাতিকে আল্লাহ তা'আলা মর্যাদা দান করিয়াছেন। কিন্তু মানব জাতির মধ্যে (সে যে-কোন ধর্মাবলম্বী হউক না কেন) বিবাহ বন্ধনের প্রথা আদিকাল হইতেই প্রচলিত আছে। শুধু পুরাতন প্রথা বলিয়াই ইহা ইসলাম ধর্মে স্থান পায় নাই; বরং স্থান পাওয়ার কারণ এই যে, ইহার পিছনে কোরআন-হাদীসের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এবং প্রত্যেক যুগের নবীগণের সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

নারীর সতীত্ব রক্ষা করা যেমন আদি ফরয, নারী-পুরুষের মিলনের জন্য বিবাহ বন্ধনও তেমনি ফরয।

বিবাহ ইসলামী সভ্যতার একটি প্রধান অংগ। ইহা একটি সুসভ্য পবিত্র ধর্মীয় চুক্তি। এই পবিত্র চুক্তির জন্য বর-কনে উভয় পক্ষের (তরফাইনের) শপথ ও স্বীকারোক্তি প্রয়োজন এবং তাহাদের স্বীকারোক্তি বা ইজাব-কবুল সর্বসমক্ষে বা অন্ততঃপক্ষে প্রয়োজনীয় সাক্ষীর সাক্ষাতে হওয়া চাই। এই পবিত্র চুক্তির বিষয়-বস্তুসমূহ ইসলামী সভ্যতার প্রাধান্যের যুগে সকলেরই জানা ছিল। এইজন্য সে জমানার যে মাসআলাগুলির উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় নাই—সেগুলি এই খৃষ্টানী সভ্যতার, তথা পাশ্চাত্য বর্বরতার প্রাধান্যের যুগে ইসলামী শিক্ষার অভাব হেতু, ইসলামের অন্যান্য মাসআলার ন্যায় বিবাহের চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কেও জনসাধারণ অজ্ঞ হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ যাহারা ধর্মকে বাদ দিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও সভ্যতার অনুসারী হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই মনে ইসলামী-সভ্যতা সম্পর্কে এমনকি পাপ-পুণ্য সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহের উদ্বেগ হইয়া পড়িয়াছে। একদল লোক ত মানব সভ্যতার কোন সনদ না পাইয়া পশুত্বের দিকে দ্রুত গতিতে ধাবিত হইতেছে। এইজন্য আমি বিবাহ-চুক্তির বিষয়বস্তুগুলিকে কোরআন-হাদীস হইতে সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিতেছি যাহাতে কেহ পদস্থলিত না হইতে পারে।

বিবাহ চুক্তি হয় একটি যুবক এবং একটি যুবতীর মধ্যে। কিন্তু যেহেতু যুবক ও যুবতীর মধ্যে উভয়ই বাস্তব অভিজ্ঞতাহীন এবং ভাবাবেগে মত্ত থাকে, সেজন্য যদিও শেষ পর্যন্ত পাত্র-পাত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহ হইতে পারে না, তবুও তাহাদের মুর্কব্বিয়ানদের মধ্যে যাহাদের দাম্পত্য জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, যাহাদের মধ্যে এতদুভয়ের হিতকামনা প্রেরণাও পুরাপুরি বর্তমান আছে, এমন মুর্কব্বিয়ানদের দ্বারাই পাত্র-পাত্রী নির্বাচিত হইয়া থাকে। ইহা শুধু প্রথাই নহে; বরং সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসংগত এবং কোরআন-হাদীস দ্বারাও সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত, বিশেষ করিয়া পাত্রীর পক্ষে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, খৃষ্টানী সভ্যতার এবং পাশ্চাত্য বর্বরতার অঙ্ক

অনুকরণকারীরা courtship প্রথা অর্থাৎ, বিবাহের পূর্বে অবাধ ও স্বাধীনভাবে মেলামেশার দ্বারা পাত্র-পাত্রীর পরস্পরের জানা-শোনা ও পছন্দ করার প্রথাকে এদেশে চালু করিতে চাহিতেছে। আবার কেহ বা ইহাকে যুগের চাহিদা সাব্যস্ত করিয়া আমলও শুরু করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহা যুগের চাহিদা নহে; বরং ইহা হীনমন্যতা ও বিবেক-বিচারহীন প্রবৃত্তির চাহিদা। যখন পতন আসে তখন মানুষ এমনি করিয়াই বিবেক বুদ্ধিহীন হইয়া থাকে। ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করিয়া মানুষ কখনও মনুষ্যত্বের উন্নতি করিতে পার না, পারে একমাত্র পশুত্বের বিকাশ সাধন করিতে। এই জন্য কোরআন মজীদে আল্লাহ্ পাক সমগ্র জগৎবাসীকে বজ্রগস্তীর স্বরে জানাইয়া দিয়াছেন— وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ— ইহার মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ্ মানুষের ভিতর দুইটি জিনিস সৃষ্টি করিয়াছেন; একটি বিবেক (قلب) আর একটি প্রবৃত্তি (هوى نفس)। তারপর তিনি জানাইয়া দিতেছেন যে, “যাহারা প্রবৃত্তির বশবতী হইবে তাহারা নিশ্চয়ই বিপথগামী হইবে।”

### পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

আমাদের নবী করীম (দঃ) বলিয়া গিয়াছেন, সাধারণতঃ লোকে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনকালে কুলীন বংশ, চামড়ার চাকচিক্য ও রূপ-সৌন্দর্য এবং মেয়ের পিতার অর্থ সম্পত্তি তালাশ করিয়া থাকে; কিন্তু তোমরা যারা আমার উম্মত তোমাদিগকে আমি বলিতেছি, খবরদার! খবরদার!! সর্বাঞ্চে তোমরা লক্ষ্য করিবে—দ্বীনদারী ও পরহেয়গারীর দিকে ঈমান ঠিক আছে কি না, নামায রোযার পাবন্দী আছে কি না, পর্দা পুশিদা ও সতীত্ব আছে কি না? আদব তমীয, মুরক্বি মান্যতা, পতিভক্তি, ছবর বরদাশত ও অল্পে তুষ্টির গুণ আছে কি না? সারকথা এই যে, রূপের চেয়ে বংশের চেয়ে এবং সম্পত্তির চেয়ে চরিত্রগুণের মূল্য অনেক বেশী। কাজেই সর্বাঞ্চে তাহাই হইতে হইবে লক্ষণীয় বিষয়। সাবধান থাকিতে হইবে যে, আজকাল অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়—কোন কোন আধুনিক নব্যশিক্ষিত যুবক-যুবতীর মধ্যে ঈমানদারী নাই, রোযা নামায নাই, পর্দা ও সতীত্বের কোন পরোয়া নাই। ইসলাম ধর্মের প্রতি কোন আস্থা নাই। কাজেই খবরদার! পাত্র-পাত্রীর দ্বীনদারী ও পরহেয়গারীর অবস্থা অবশ্য বিশেষভাবে তাহকীক করিয়া পাত্র-পাত্রীর নির্বাচন করিবে।

### স্বামী-স্ত্রীর শপথ গ্রহণ

বিবাহ চুক্তিতে স্বামীর পক্ষের শপথ নিম্নরূপ হইবেঃ আমি স্ত্রীর (১) খোরাক (২) পোশাক ও (৩) থাকার ঘরের দায়িত্ব ভার এবং (৪) স্ত্রীর ইজ্জত-আবরু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতেছি। আর আমি (৫) স্ত্রীর সংগে যাবজ্জীবন সদ্ব্যবহারের অংগীকারও করিতেছি।

স্ত্রীর পক্ষের শপথ নিম্নরূপ হইবেঃ দুইটি মানুষের দ্বারা একটি সংসার গঠিত হইবে। দুইটি মানুষ দুই দিকে গেলে, সে সংসারে উন্নতি সুদূর পরাহত। কাজেই একজনের নিশ্চয়ই অনুগমন-কারী বা অনুসরণকারী হইতে হইবে। দুইটি মানুষ পৃথক পৃথকভাবে একেবারে অসম্পূর্ণ। দুইটি মানুষ মিলিয়াই একটি পূর্ণ মানুষ হইতে পারে। সুতরাং অংগীকার করিতেছি যে, (১) আমি আমার অস্তিত্বকে অদ্য হইতে আমার স্বামীর অস্তিত্বের সঙ্গে মিশাইয়া দিলাম। আমি স্বামীর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিলাম। পতিই সতীর গতি—পতি-ভক্তিই সতী নারীর সর্বাপেক্ষা বড় পুণ্য— একথা আমি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া নিলাম। স্বামীর গার্হস্থ্য বিষয়াদি আমারই গার্হস্থ্য বিষয়।

স্বামীর সন্তান আমার সন্তান। স্বামীর মান-ইজ্জত আমারই মান-ইজ্জত। কাজেই (২) স্বামীর গৃহ ও গার্হস্থ্য বিষয়াদির রক্ষণাবেক্ষণ আমারই দায়িত্ব, (৩) স্বামীর সন্তান পালন আমারই দায়িত্ব, (৪) স্বামীর শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা আমারই দায়িত্ব এবং (৫) স্বামীর মান-ইজ্জত রক্ষা করাও আমারই দায়িত্ব।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের শপথ নিম্নরূপঃ আমাদের গুপ্ত অঙ্গের কোনরূপ ব্যবহার একমাত্র স্বামীর সহমিলন ব্যতিরেকে আমরা কুত্রাপি অন্য কোথাও করিব না; ইহা কঠোরভাবে হারাম বলিয়া বিশ্বাস করি। অতএব, আমরা একে অন্যের গোপন ভেদ রক্ষণের এবং নিজ নিজ সততা ও সতীত্ব রক্ষণের অংগীকারে আবদ্ধ হইতেছি।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এমনই মধুর প্রেমময় সম্পর্ক যে, এ ক্ষেত্রে আইন অপেক্ষা প্রেমই কার্যকরী করিতে হয় বেশী। যদিও আইনগতভাবে স্ত্রীর ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ স্বামীর জিন্মায়, যদিও হাট-বাজার, মাঠ-ঘাট, কাচারী, দরবার প্রভৃতি স্বামীই করে, কিন্তু সে তাহার স্ত্রীর হাতেই খাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করে। স্ত্রী স্বামীর ঘর সুসজ্জিত করিয়া রাখে। স্ত্রীই স্বামীর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করিয়া রাখে, স্ত্রীর কারণেই দরবারে স্বামীর সম্মান বৃদ্ধি পায়। স্ত্রীর দরবারের কাজ স্বামীই করিয়া দেন। কাজেই ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করিলে পুরুষ জাতির পৃথক পৃথক শ্রেণী যুদ্ধ লাগানোর আদৌ কোন প্রশ্ন দেখা যায় না। কারণ, ইসলামের আইনগুলি পুরুষের গড়া নয়। স্বয়ং তিনি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সৃষ্টিকর্তা, তাহারই গড়ান।

খৃষ্টান পাদ্রীগণ বা হিন্দুসন্ন্যাসীরা বিবাহকে ধর্ম-বিরোধী মনে করিয়াছে। কিন্তু ইসলাম বিবাহকে ধর্মের একটি বিশেষ অংগ বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছে। কিন্তু বিবাহ ক্রিয়া কোন ব্যক্তির জন্য ধর্মের অংগ তখনই হইবে, যখন ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক বিবাহকারীই আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত শরীঅতের বিধান ও উপদেশানুসারে বিবাহ সম্পর্কিত কর্তব্যসমূহ সমাধা করিবে।

বৈবাহিক জীবন-যাপনই আমাদের নবীর আদর্শ। এখানে দুইটি কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন মনে হইতেছে। একটি কথা এই যে, বৈবাহিক জীবনের বিপরীত দিক কি এবং উহা কেমন? বৈবাহিক জীবনের বিপরীত দিক দুইটি। একটি এই যে, বিবাহ না করিয়া সংযম অভ্যাস করত পবিত্র আল্লাহর যেক্বর-ফেক্বর এবং আল্লাহর এবাদত বন্দেগীর ভিতর দিয়া জীবন-যাপন করা। এই কথাটি আপাত-মধুর এবং স্থূল দৃষ্টিতে খুবই উচ্চ ধরনের বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে ইহার কোনই মূল্য নাই, ইহা একেবারেই অবাস্তব। দ্বিতীয় দিকটি এই যে, দায়িত্বের বোঝা বহনের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া পশুর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করা। এই দিকটা যে পশুত্বের শামিল সে কথাটা এখনো দুনিয়ার অধিকাংশ লোক কার্যতঃ স্বীকার করিতেছে। কিন্তু ভবিষ্যতে এমনও দিন আসিতে পারে, যেদিন উচ্ছৃঙ্খল মানুষেরা ইহাকে পশুত্ব মনে না করিয়া পরম মনুষ্যত্ব মনে করিবে। কিন্তু শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জন মানুষ অস্বীকার করিলেও যেটা সত্য সেটা চিরকালই সত্য। আমাদের নবী (আঃ) বলিয়াছেনঃ

○ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

অর্থাৎ, বৈবাহিক জীবন যাপন করা আমার আদর্শ। যে আমার আদর্শকে অবজ্ঞা করিবে, তাহার সঙ্গে আমার কোনই সম্পর্ক নাই।

দ্বিতীয় কথাটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং প্রথম কথাটির পরিপূরকও বটে। উহা এই যে, আমাদের আদর্শ এবং অন্যান্য জাতির আদর্শের মধ্যে পার্থক্য আছে। অন্যান্য জাতির আদর্শ মানুষের

রচিত—যাহা ভুল প্রমাদ হইতে মোটেই মুক্ত নয়, আর ভুল ধরা পড়িলে উহা পরিবর্তিত হইতেও বাধ্য। পক্ষান্তরে ইসলামের আদর্শগুলির একটিও মানুষের রচিত নহে। সম্পূর্ণ আল্লাহর প্রেরিত নবী কর্তৃক প্রমাণিত। কাজেই ইহা ভুল—প্রমাদের উর্ধ্ব এবং অপরিবর্তনীয়। এখানে প্রশ্ন জাগে যে, ইসলামের সব আদর্শই অপরিবর্তনীয় হইলে কালের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলা যাইবে কি করিয়া? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, ইসলামের বিধানগুলি যেহেতু মানুষের রচিত নহে; বরং সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী ও অন্তর্যামী খোদার রচিত, কাজেই যে যে বিষয়ে মানুষের উন্নতির জন্য পরিবর্তন পরিবর্তন আবশ্যিক, সে সে বিষয়ে মূল নীতিসমূহের পরিবর্তন ব্যতিরেকেই শাখানীতি রচনার যথেষ্ট অবকাশ রাখা হইয়াছে। এবং যে যে বিষয়ে পরিবর্তনের কোন আবশ্যিকতা নাই, সে সে বিষয়কে সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয় রাখা হইয়াছে। এই বিষয়টিই নবী আলাইহিসসালাম এইভাবে বুঝাইয়াছেন— **أُوتِيَتْ جَوَامِعَ الْكَلِمِ** ইহার মর্মার্থ এই যে, আমাকে আল্লাহ তা'আলা যেমন ব্যাপক শরী'অত দান করিয়াছে, ভাষাও তদ্রূপ ব্যাপকভাবে দান করিয়াছেন।

ইসলামের বিধানগুলিকে ছয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :

(১) ঈমানিয়াত—অর্থাৎ তাওহীদ, রেসালাৎ ও আখেরাত। ইহা সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়। আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত একইরূপ রহিয়াছে এবং একইরূপ থাকিবে। হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর পূর্বে নবী ও রাসূলের পরিবর্তন ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার পরে রাসূল ও নবী আসার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(২) রূহানিয়াত—অর্থাৎ কলেমা, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ। এসমুদয়ও অপরিবর্তনীয়। মানবতার উন্নতির জন্য পরিবর্তনের কোনই আবশ্যিকতা নাই।

(৩) আখলাকিয়াত—অর্থাৎ সত্য, সততা, সতীত্ব, সহানুভূতি, সহৃদয়তা, সেবা ও সুবিচার ইত্যাদি। এসব চির অপরিবর্তনীয়।

(৪) সমাজ-ব্যবস্থা (سماجيات - تهذيب و ثقافت) অর্থাৎ, ইসলামী পোশাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তা, আচার-ব্যবহার, পানাহার, চাল-চলন ইত্যাদি। ইসলামী তাহযীবকে পরিবর্তন করিয়া বা বাদ দিয়া খৃষ্টানী বা হিন্দুয়ানী তাহযীব গ্রহণ করার কোনই প্রয়োজন নাই। মানবতার উন্নতির জন্য ধৃতি পরার, ফুলপ্যাণ্ট, হ্যাট-নেকটাই পরার, নিজ স্ত্রী দ্বারা পরপুরুষের খেদমত করানোর, হ্যাণ্ডশেক করার, ড্যান্স করার, মাথা খুলিয়া বুক ফুলাইয়া হাটে-বাজারে চলাফেরা করার, পর্দাহীন বাড়ি তৈরী করার, কুকুর পালার, ছবি রাখার, খাড়া হইয়া খাওয়ার, খাড়া হইয়া পেশাব করার, পেশাব-পায়খানা করিয়া পাক না হওয়ার, স্ত্রী-সহবাস করিয়া গোসল না করার, দাড়ি মুণ্ডানের, বগলের পশম বাড়ানের, একাধিক বিবাহ বন্ধ করার, সন্তানের জন্মরোধ করার, আওরতের হাতে তালাকের ক্ষমতা দেওয়ার, জাতীয়তার সংজ্ঞা পরিবর্তনের, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় দৌড়ানের, ছবি-খেলনা আমদানী করার, শূকর বা শরব খাওয়ার, 'আসসালামু আলাইকুম' বলাকে এবং উহার জবাব দেওয়াকে অপমান মনে করা ইত্যাদির আদৌ কোন আবশ্যিক করে না। এই সকল কাজ শুধু ঐ সকল মুসলমানই নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা অনুসারে করিতে পারে যাহারা জাতীয় গৌরব ভুলিয়া পরানুকরণ ও জঘন্য নীচাশয়তার রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ এইরূপ দুর্ভাগ্যবাহী মুসলিম জাতিকে কলঙ্কের টিকা পরাইয়া দিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে শরী'অতে মোকাদ্দাসার অর্থাৎ পবিত্র ও সনাতন ইসলাম ধর্মের ব্যবস্থা এতই সুন্দর যে, তাহাতে কাহারো মনমরাও হইতে হয় না। তাহার মধ্যে পরানুকরণের রোগও ঢুকিতে পারে না বা বিলাসিতা বা

অকর্মণ্যতার রোগেও আক্রমণ করিতে পারে না। শরীঅতে মোকাদ্দাসা কতকগুলি সীমারেখা টানিয়া দিয়াছে। নূতনত্বের পথও বন্ধ করে নাই, আর উন্নতির পথও রুদ্ধ করে নাই।

(৫) অর্থ-ব্যবস্থা,

(৬) (ক) রাষ্ট্র-ব্যবস্থা,

(খ) সমর-ব্যবস্থা,

(গ) আন্তর্জাতিক চুক্তি,

(ঘ) বিজ্ঞান চর্চা,

(ঙ) সাহিত্য ও ভাষা চর্চা,

(চ) যোগাযোগ ব্যবস্থা।

অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে শরীঅতে মোকাদ্দাসা আমাদেরকে কতকগুলি অপরিবর্তনীয় মূলনীতি দান করিয়াছেঃ—যেমন, সুদ হারাম, জুয়া হারাম, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা হারাম, ঘুষ হারাম, চুরি হারাম, আমানতে খেয়ানত হারাম, জোর দখল হারাম ইত্যাদি। এই মূলনীতিগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যত ইচ্ছা উন্নতি করা যাইতে পারে। এখানে শরীঅতে মোকাদ্দাসা প্রয়োগ-পদ্ধতিকে সীমাবদ্ধ করে নাই; বরং সীমাহীন উন্নতির পথ করিয়া দিয়াছে।

পাশ্চাত্যের হুমকির ভয়ে ভীত হইলে চলিবে না। নিজেদের মস্তিস্ক (Brain) খাটাইতে হইবে। অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া নূতন নূতন পথের সন্ধান করিতে হইবে। জনসংখ্যা বন্ধ করিবার অধিকার কাহারও নাই। জনসেবার জন্যই হুকুমত, জনসংখ্যা বৃদ্ধি বন্ধ করার জন্য নয়। পাশ্চাত্য পীর ছাহেবগণ বলিয়াছেন, সুদ ছাড়া ব্যাঙ্ক চলে না, জুয়া ছাড়া কারবার চলে না। সে সব পীর ছাহেবদের অন্ধ অনুকরণ করা যাইবে না। সুদ ছাড়া ব্যাঙ্ক করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে। জুয়া ছাড়া কারবারের উন্নতি করিয়া আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে। ‘জোর দখল’ অর্থাৎ, ‘জোর যার মুল্লুক তার’ দুর্নীতি দ্বারা যথেষ্ট হুকুম বা যথেষ্ট ট্যাক্স বৃদ্ধি করা চলিবে না। শরীঅতের জ্ঞান অর্জন করিয়া শরীঅতের সীমার ভিতরে থাকিতে হইবে।

রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্যও শরীঅতে মোকাদ্দাসা কোনরূপ উন্নতির পথ বন্ধ করে নাই। যুগের সাথে তাল মিলাইয়া চলা তথা যুগের দাসত্ব করার হীন মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে। যুগের স্রষ্টা হইতে হইবে;—যুগের চালক ও নায়ক হইতে হইবে। খোদা রাসূলের অধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়া কোরআন হাদীসের অধীন হইয়াই আইন প্রণয়ন করিতে হইবে। কোরআন ও সুন্নার বিরুদ্ধে কোন আইনই প্রণয়ন করা যাইবে না। যে কোন আইনই হউক কোরআন হাদীসের কষ্টি-পাথরে যাচাই করিয়া লওয়ার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই থাকিবে।

সমর ব্যবস্থার পদ্ধতি ও উহার হাতিয়ার সম্বন্ধে শরীঅতে মোকাদ্দাসা কোথাও উন্নতির পথ বন্ধ করে নাই। তবে এখানেও কতকগুলি মূলনীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। খোদাকে এবং মানবতাকে বাদ দিয়া নিষ্ঠুর ও নির্মম আঞ্চলিকতাবাদ বা ভৌগলিক জাতীয়তাবাদকে কিছুতেই গ্রহণ করা যাইবে না। নিজেদের স্বার্থে অন্যের উপর যুলুম চালান যাইবে না।

আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে চুক্তি করা যাইবে। যে কোন মুহূর্তে উহা শেষ করার ঘোষণাও দেওয়া যাইবে। কিন্তু চুক্তি বহাল রাখা অবস্থায় উহার খেলাফ বা বিরোধিতা করা যাইবে না। তবে অন্যে যাহাতে ধোঁকা দিতে না পারে, সেদিকে সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বৈজ্ঞানিক পন্থায় যোগাযোগ ব্যবস্থায় যাবতীয় উন্নতি করা যাইতে পারিবে, ইহাতে বাধা নাই।

বিজ্ঞান চর্চার উন্নতি করিতে শরীঅতে-ইসলাম কোথাও বাধা দেয় নাই। কিন্তু বিজ্ঞান চর্চার বিষয়বস্তুতে যদি খোদাকে, খোদার রাসুলকে, খোদার ওহীকে, আখেরাতের জিন্দেগী বা অদৃশ্য জগতকে অস্বীকার করা হয়, তবে উহা বিজ্ঞান চর্চাকারীর জন্য সম্পূর্ণরূপেই অনধিকার চর্চা হইবে। কারণ, বিজ্ঞান মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান। এই সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বাহিরে অন্য কিছুই অস্তিত্বই নাই, এরূপ উক্তি করা বৈজ্ঞানিকের জন্য চরম অবৈজ্ঞানিকতা বটে এবং সম্পূর্ণরূপেই অযৌক্তিক ও হাস্যকর।

রাষ্ট্রব্যবস্থায় শরীঅতের সীমা লংঘন করিয়া হালাল-হারামের কোনরূপ পরওয়া না করিয়া উন্নতি কল্পনা করার অধিকার মানুষের নাই। শরীঅত প্রদত্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই শিরোধার্য করিয়া লইতে হইবে।

ভাষা বা সাহিত্যের চর্চা করিতে শরীঅতের কোথাও বাধা দেওয়া হয় নাই। তবে জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে অবশ্যই বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। পরানুকরণ প্রবণতাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে হইবে। বিজাতীয় নোংরা প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া নিজের জাতীয় গৌরবকে ভুলিয়া গেলে চলিবে না। আপাতঃ মধুর চাকচিক্য দেখিয়া তাহাদের পদলেহন করিলেও চলিবে না; বরং নিজেদের জাতীয় নির্ভুল আদর্শকে এবং নিখুঁত তাহ্মীবকে সর্বোপরি স্থান দিতে হইবে। নিজেদের সংহতিকে দৃঢ় করিয়া ক্রমাগত যাহাতে একটি কেন্দ্রীয় ভাষায় এবং একটি কেন্দ্রীয় তাহ্মীবে আমরা একতাবদ্ধ হইতে পারি, সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। শত্রু আমাদের আছে, তাহারা অতি চালাক। তাই শত্রু ও চোরদের প্রতি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের কচি-কাঁচার দলকে গায়ের ইসলামী তাহ্মীবের পরিবেশ হইতে অর্থাৎ তাহাদের কুসংসর্গ হইতে সর্বক্ষণ দূরে রাখিতে হইবে। পরাধীন যুগের পরানুকরণের প্রভাবের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া নিজেদের জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। গোড়ার গলদ দূর করিতে হইবে। গোড়ার গলদ কী? আমাদের প্রাণপ্রিয় পয়গম্বর আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন : জীবনে যত কাজ কর, প্রত্যেক কাজের প্রারম্ভে নিয়ত ঠিক করিয়া লও; অর্থাৎ, দেলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঠিক করিয়া লও। তোমার মঞ্জিলে কমসূদ—তোমার গম্ভাবস্থানকে ঠিক করিয়া লও। এই লক্ষ্য স্থির করিয়া কাজে ঝাঁপাইয়া পড়, নতুবা তোমার সময় বৃথা যাইবে, জীবন নষ্ট হইয়া যাইবে।

প্রত্যেকটি কাজের ভিতর দিয়াই তোমাকে আল্লাহ-রাসুলের দিকে ক্রমেই নিকটতী হইতে হইবে। অতএব, প্রথমেই তোমার চিন্তা করিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে, এই কাজের দ্বারা আমি আল্লাহ-রাসুলের নিকটবর্তী হইতে পারিব কি? বিবাহ-শাদীই হউক, শিক্ষা লাভই হউক, চাকুরী লাভই হউক বা ব্যবসা-বাণিজ্যই হউক, প্রত্যেকটি কাজের ভিতরেই আমাদের এরূপ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

পরিতাপের বিষয়, শত্রুরা আমাদিগকে মূল লক্ষ্য বিন্দু হইতে দূরে সরাইয়া দিয়াছে। আমাদের শিক্ষারও চরম লক্ষ্য হওয়া চাই—আল্লাহ ও রাসুলের সান্নিধ্য লাভ করা। বিবাহ-শাদীরও চরম লক্ষ্য হওয়া চাই—আল্লাহ রাসুলের প্রতি অগ্রসর হওয়া। লক্ষ্য ঠিক থাকিলে আমাদের সমগ্র জীবনই সঠিক পথে চলিত হইবে।

## বিবাহ সম্পর্কে আরো কথা

বিবাহের মধ্যে ইসলামী বিধান অনুসারে চারিটি আদর্শ কর্তব্য আছে। যথা—(১) নিয়ত দুরন্ত করা অর্থাৎ লক্ষ্য ঠিক করা। বিবাহের উদ্দেশ্য হইবে পশু-প্রবৃত্তিকে পূর্ণ করা নয় বা শুধুমাত্র সাংসারিক জীবনের একজন সাথী তালাশ করাই নয়, বরং মূল উদ্দেশ্য এই হইবে যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে ও রাসূলের আদর্শ (সুন্নত তরীকা) অনুসারে দুইজন মানুষ (স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের জীবন-সাথী হইয়া দুনিয়াতে আপন আপন দায়িত্ব পালন করিয়া দুনিয়া ও আখেরাতের কাজে একে অন্যের সহায়তা করিয়া আল্লাহর মর্জি মোতাবেক আল্লাহর সংসারকে আবাদ করিবে। আল্লাহর বান্দা ও নবীর উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে এবং পরে সকলে একসঙ্গে আল্লাহর সাম্রাজ্য লাভ করিবে।

(২) স্বামী-স্ত্রীর প্রথম যখন নির্জনে মোলাকাত হইবে, তখন স্বামী তাহার দুই হাত দিয়া স্ত্রীর মাথা ধরিয়া মুখে চুম্বন করিবে এবং আল্লাহর কাছে দো'আ করিবে :

○ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

“হে খোদা! এই দুনিয়ার সব কিছুর মধ্যে ভাল-মন্দ দুই-ই আছে। তুমি যে আমাকে এই (স্ত্রীরূপ) নেয়ামত দান করিয়াছ তাহার ভালায়ী (মঙ্গল) আমি তোমার কাছে চাই এবং ইহার বুরায়ী (মন্দ) হইতে তুমি আমাকে রক্ষা করিও।”

[বুরায়ী এই যে, স্ত্রীর কারণে দুনিয়ার ও দ্বীনের কোন নোকসান হইয়া যাওয়া এবং ভালায়ী হইতেছে স্ত্রীর কারণে দুনিয়ার ও দ্বীনের উপকার লাভ হওয়া]

(৩) স্বামী স্ত্রী যখন প্রথম নির্জনে মোলাকাত করিবে, তখন তাহারা যৌবনের উন্মাদনায় সাধারণতঃ ভাবপ্রবণতায় অধীর থাকে। কিন্তু যে হইবে মুসলমান—সে যুবকই হউক বা বৃদ্ধই হউক—তাহাকে সর্ব অবস্থাতেই আল্লাহ প্রেমের ভাব প্রবণতাকেই তাহার দৈহিক ভাব-প্রবণতার উপর স্থান দিতে হইবে। স্বামী-স্ত্রীর মিলন-মুহুর্তেও আল্লাহকে স্মরণ রাখিতে হইবে। নিজেদের স্বার্থেও আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ রাখিতে হইবে। বস্তুতঃ আমাদের পরম শত্রু শয়তান যেমন আমাদের গাফলতির সুযোগ অনুসন্ধান করে, আমাদেরও তেমনি তার সুযোগ পণ্ড করিয়া দেওয়ার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। মিলন পূর্বে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট দো'আ করিবে :

○ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَبَبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَبَبَ الشَّيْطَانُ مَا رَزَقْتَنَا

অর্থাৎ, হে খোদা! এই অবস্থায়ও আমরা তোমাকে ভুলি নাই, আমরা তোমার নাম স্মরণ করিতেছি। তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। হে খোদা! আমাদেরকে শয়তানের প্রভাব হইতে বাঁচাইয়া রাখ এবং আমাদেরকে তুমি যে আওলাদ দান করিবে, তাহাকে শয়তানের প্রভাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিও।

(৪) স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পূর্বে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেন ঋতু অবস্থায় মিলন না হয়, মলদ্বারে সঙ্গম না হয়। কারণ, ঋতু অবস্থায় বা মলদ্বারে সঙ্গম করা মহাপাপ, সাংঘাতিক হারাম। তাহাদের

মিলন এমন নির্জন স্থানে হওয়া চাই যেন অন্য কেহ না থাকে বা অন্য কেহ দেখিতে না পায়। স্বামী-স্ত্রীর গোপন ব্যবহার বা আলাপ-আলোচনা অন্য কাহারও জন্য উঁকি মারিয়া দেখা বা কান লাগাইয়া শুনা সম্পূর্ণরূপে হারাম। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক গোপন আচার-ব্যবহার অন্য কাহারও কাছে বলা বা প্রকাশ করাও হারাম। মিলনান্তে, ফজরের নামায কাযা না হয় এমনভাবে সকালে উঠিয়া উভয়কেই গোসল করিতে হইবে। মিলনের পরে উভয়ের উপরই গোসল ফরয হইয়া যায়। এজন্য পানির ব্যবস্থা আগে হইতেই করিয়া রাখা দরকার।

## সন্তান জন্মিলে

১। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ছেলেই হউক আর মেয়েই হউক, সর্বপ্রথম যে আওয়ায তাহার কানে পড়িবে, তাহা হওয়া চাই আল্লাহর নাম এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের গুণগান। ২। সন্তান জন্মিলে সর্ব-প্রথম তাহার পেটে যাহা প্রবেশ করিবে তাহা হওয়া চাই কোন নেককার বুয়ুর্গ লোকের দ্বারা আল্লাহর যেকেরের সঙ্গে সঙ্গে কোন মিষ্টি জিনিস—মধু, খোরমা বা অন্য কোন মিষ্টি খাদ্য চিবাইয়া লালার মত করিয়া অঙ্গুলির দ্বারা শিশুর মুখে তালুতে লাগাইয়া দেওয়া। ৩। সপ্তম দিবসে কোন আল্লাহুওয়াল্লা বুয়ুর্গ লোকের দ্বারা দো'আ করাইয়া ভাল দেখিয়া নাম রাখা, মাথা মুণ্ডাইয়া ফেলা এবং আকীকাহ করা। ৪। সন্তানের দেহ পালন ও স্বাস্থ্য গঠনের সুবন্দোবস্ত করা। শুধু তাহাই নহে—সন্তানকে স্বাস্থ্যবান করার নিমিত্ত যেমন নিয়মিতভাবে সুখাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়, তৎসঙ্গে শৈশব হইতেই তাহার আত্মার প্রতিপালনের প্রতিও তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রদান করা আবশ্যিক। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, শিশুর আত্মার প্রতিপালন সে আবার কেমন কথা? মনে রাখা আবশ্যিক, শিশুর মস্তিষ্ক ফটো তোলা ক্যামেরার তুল্য। সে যাহাকিছু দেখে ও শুনে, তাহাই তাহার মস্তিষ্কে অঙ্কিত হইয়া যায়। অতএব, লক্ষ্য রাখিতে হইবে—যেন তাহার চোখের সম্মুখে কোন খারাপ ব্যবহার বা কার্য করা না হয়। কোন অলীল বা খারাপ শব্দ যেন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতে না পারে। যাহাতে তাহার সামনে ভাল কাজ করা হয়, তাহার কানের কাছে ভাল আলাপ-আলোচনা, কোরআন তেলাওয়াত এবং আল্লাহর গুণগান করা হয়, তৎপ্রতি বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন নেওয়া আবশ্যিক।

শিশুর জন্য মায়ের দুধই সর্বপেক্ষা উত্তম খাদ্য। কিন্তু স্বাস্থ্যের অভাবে মায়ের দুধ দূষিত হইলে, শিশুর পক্ষে সে মায়ের দুধের চেয়ে খারাব খাদ্য আর কিছুই নাই। স্বাস্থ্যহীনা মাতার স্তন-দুগ্ধ পান করিয়া অনেক শিশুর মাতৃকায় দোষ দেখা দেয়। লোকে উহাকে জ্বিনের আছর মনে করে; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে জ্বিনের আছর হয় না। রোগের তাছিরও হয়। শিশুকে তীব্র আলোকে নিলে শিশুর চোখের জ্যোতি খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

শিশুর যখন প্রথম কথা ফুটিবে তখন সর্বপ্রথম তাহাকে আল্লাহর নাম, বিস্মিল্লাহ, কলেমা ইত্যাদি শিখাইবে। বাপের নাম, দাদার নাম, বাসস্থানের নাম-ঠিকানা ডাইন-বাম ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে শিক্ষা দিবে।

শিশুর বয়স ৫/৬ বৎসরের কাছাকাছি হইলে কোন নেককার বুয়ুর্গ আলেম দ্বারা দো'আ করাইয়া তাহাকে আল্লাহর কালামও শিক্ষা দেওয়ার সূচনা করিবে। অর্থাৎ, বিস্মিল্লাহ শুরু করাইবে। এই উদ্দেশ্যে শিশুকে কোন নেককার আদর্শবান ওস্তাদের মক্তবে পাঠাইবে। মনে



রাখিবে প্রাথমিক শিক্ষার উপরই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়া থাকে। উপরোক্ত বিষয়গুলি ইতিপূর্বেও সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে।

### মকতব ও মাদ্রাসা সম্বন্ধে আরো কথা

মকতবে ছেলেমেয়েদেরকে কায়দা, ছিঁপারা ও কোরআন শরীফ ত শুদ্ধ করিয়া পড়ান চাই-ই, তার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর নিরানববই নাম, চারি কলেমা, ঈমানে মুজ্‌মাল, ঈমানে মুফাছাল প্রভৃতি অর্থসহ পড়ান চাই। এ ছাড়া মোটামুটি ইসলামী আক্বায়েদ, নামায, রোযা, পাক-নাপাক, হলাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয প্রভৃতি মাসআলা মাসায়েল, ইসলামী আদব-কায়দা ও চরিত্র গঠন প্রভৃতি শিক্ষা দিতে হইবে। নবী করীম (দঃ)-এর জীবনী এবং চারি খলিফার জীবনী দেশীয় মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে হইবে। তারপর হলালভাবে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য কোন একটি হাতের কাজ—মেয়েদিগকে হস্তশিল্প, গৃহস্থালী রক্ষণাবেক্ষণ (বা গার্হস্থ্য বিজ্ঞান), সেলাই, রন্ধন, সন্তান পালন, পতি-ভক্তি, পতি-সেবা প্রভৃতি খুব ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া দরকার। এতদ্ভিন্ন তাহাদিগকে পারিবারিক চিকিৎসা-বিদ্যা, ধাত্রী-বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া উচিত। অবশ্য সতর্ক থাকিতে হইবে যে, এসকল ক্ষেত্রে ধর্ম রক্ষা করিয়া চলা ফরয।

আজকাল হিতাহিত চিন্তা না করিয়া ইংরেজী শিক্ষার বড় হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। একথা সত্য যে, ভাষা শিক্ষা করিতে দোষ নাই। কিন্তু ভাবিবার বিষয় এই যে, মানুষের জীবন সীমাবদ্ধ, তাহার শক্তি সীমাবদ্ধ, অথচ বিষয় সীমাহীন। কাজের শক্তি ও সময়ের সীমার ভিতরে থাকিয়া আখেরাতের দৃষ্টিতে যাহা সবচাইতে বেশী আবশ্যকীয় তাহাই সর্বপ্রথমে শিখিতে হইবে। তারপর তার চেয়ে কম আবশ্যকীয়, তারপর যাহা তাহার চেয়েও কম আবশ্যকীয়। আমরা মুসলমান। আমাদের সর্বপ্রথম আবশ্যকীয় বিষয় হইতেছে আমাদের ধর্ম-ভাষা শিক্ষা করা, তারপর আবশ্যিক হইতেছে আমাদের দেশীয় রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা করা। (বিভিন্ন জ্ঞান অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষা করাতেও কোন দোষ নাই।) ইংরেজী ভাষায় বিজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে। কাজেই উচ্চস্তরের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু এজন্য সকলকেই শিশুকাল থেকে ইংরেজী ভাষা, ইংরেজী চালচলন ও ইংরেজী ফ্যাশান শিক্ষা দেওয়ার কোনই আবশ্যিক নাই। কিছুসংখ্যক মেধাবী, পরিপক্ব, ধার্মিক ও দৃঢ় আদর্শবাদী ছাত্রকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দিয়া বিদেশে পাঠান দরকার; কিংবা বিদেশ হইতে কিছুসংখ্যক পারদর্শী অধ্যাপক আনা হইয়াও উহা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। এছাড়া বিজ্ঞানের বিষয়গুলি যথাশীঘ্র নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করার দরকার, যাহাতে আমাদের নিজেদের মাতৃভাষায়ই রিসার্চ বা গবেষণা করিতে পারে।

বিদেশে ছেলেদের যখন পাঠান হইবে, তখন এমন পরিপক্ব আদর্শসম্পন্ন ছেলেদিগকে পাঠাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা বিদেশী চালচলন ও সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হইতে না পারে; বরং তাহারা সেই বিদেশে গিয়াও যেন ইসলামী তাহূযীব ও ইসলামী আদর্শের প্রাধান্য স্থাপন করিতে এবং তাহা প্রচার করিতে পারে। ইহা সর্বক্ষণই মনে রাখিতে হইবে যে, ধর্ম আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, কোন অবস্থাতেই ইহার প্রতি উদাসীন হইলে চলিবে না।

একদল লোক ধর্মবিদ্যায় পারদর্শী এবং পূর্ণ জ্ঞানী হইতে হইবে। সমাজে তাহাদিগকে স্থান দিতে হইবে সবচাইতে উন্নত স্তরে। এর জন্য উন্নত ধরনের মাদ্রাসা তথা আরবী বিশ্ববিদ্যালয়

স্থাপন করিতে হইবে এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে এমন করিতে হইবে, যাহাতে শিক্ষার সংগে সংগে কোরআন হাদীসের যাবতীয় আহকাম যেন আমলেও পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, এইসব কারণেই ইসলামী শিক্ষাগার অর্থাৎ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার চেয়ে বড় নেকের ও বেশী সওয়াবের কাজ আর নাই।

## বিবাহ সম্পর্কে আরো জ্ঞাতব্য বিষয়

ছেলে যখন এলেম শিখিয়া রোযগার করার উপযুক্ত হয় এবং মেয়ে যখন গৃহস্থালী বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত হয়, তখন বাপের কর্তব্য (বাপ না থাকিলে যিনি অভিভাবক ও অলী হইবেন তাঁহার কর্তব্য) ছেলে-মেয়েকে বিবাহ দেওয়া।

যে জিনিস যত অধিক জরুরী সেই জিনিসকে আল্লাহ্ ততই সহজলভ্য করিয়া দিয়াছেন। বিবাহ যেহেতু ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র সকল মানুষের জন্যই অত্যন্ত জরুরী, এই জন্য ইহা অতি সহজে এবং নিতান্ত অনাড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়া যাওয়াকেই আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন। তাই শরী'অতে বিবাহ ব্যাপারে ব্যয়বাহুল্য ও অতিরিক্ত আড়ম্বর নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন সমাজে কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া এই সহজসাধ্য কাজকে অত্যন্ত কঠিন করিয়া ফেলিয়াছে। বিবাহকে কঠিন করিয়া তোলা অন্যায়, তবে যথাসম্ভব মর্যাদা রক্ষিত হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

বিবাহে স্ত্রীর জন্য যথোপযোগী জেওর ও মহর হওয়ার দরকার। কারণ, পুরুষের মর্যাদা এই যে, সে যে একটি পরিবারের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত, সে কথার সক্রিয় প্রমাণ তাহাকে পেশ করিতে হইবে। ভবিষ্যতে সে যে তাহার স্ত্রীকে দাসীরূপে না দেখিয়া প্রেমপাত্রী, মাহবুবা ও মা'শুকারূপে দেখিবে, তার প্রমাণস্বরূপ তাহাকে মহর-জেওর দিতে হইবে। কিন্তু মহর কোন ক্রমেই পাত্রের বহনশক্তির অতিরিক্ত হওয়া চাই না। এইরূপে মেয়ের পিতার কাছে মেয়ে জামাই যে স্নেহের পাত্র ও অত্যন্ত আদরণীয় তাহার প্রমাণস্বরূপ মেয়ে-জামাইকে কিছু জেহিয বা যৌতুক দিতে হইবে। কিন্তু এক্ষেত্রেও অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিতে হইবে। মহর-জেওর এবং জেহিযের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মহর ত দাবী করিয়া লওয়া যাইবে, কিন্তু জেহিয দাবী করিয়া লওয়া যায় না। আজকাল পাত্রী পক্ষের নিকট খরচের ও নানাবিধ যৌতুকের দাবী করার একটি কু-প্রথা আমাদের শিক্ষিত সমাজে চালু হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত জঘন্য ও ঘৃণা প্রথা। পাত্রী পক্ষকে কোন টাকার চাপ দেওয়ার অর্থ হইতেছে শরী'অতকে উল্টাইয়া দেওয়া। কেননা আল্লাহ্ পাত্র পক্ষের উপর মহর, জেওর ফরয করিয়াছেন। পক্ষান্তরে পাত্রীপক্ষের উপর খরচ দেওয়া আদৌ ফরয করেন নাই। পাত্রীর পিতা ১৪/১৫ বৎসর যাবৎ বহু অর্থ ব্যয় ও অতি আদর যত্নে লালন-পালন করিয়া তাহার কলিজার টুকরাকে পরের হাতে জীবনের তরে সোপর্দ করিতেছে, ইহাই ত অনেক বেশী। ইহারই ত শোকরিয়া আদায় করিয়া শেষ করা যায় না। এর পরেও তাহার উপর কিছু দাবী করা বা চাপ দেওয়া যুল্ম ছাড়া আর কি হইতে পারে? অবশ্য পাত্রপক্ষের বিনা দাবীতে, বিনা চাপে মহরবতের আলামতস্বরূপ পাত্রীর মাতাপিতা যদি তাহাদের সংগতি অনুসারে কন্যাজামাতাকে কিছু দান করেন, তবে তাহাও শোকরিয়ার কাবেল হইবে। ধনীরা বিবাহের মধ্যে অনেক আড়ম্বর করে ও তাহাদের দেখাদেখি গরীবরাও ঐরূপ করিতে চায়; ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাহারা ঋণও গ্রহণ করিয়া বসে। এইজন্য কাহারও পক্ষেই বেশী আড়ম্বর করা সংগত নহে।

আমাদের হযরত নবী আলাইহিস্‌সালাম দোনো জাহানের বাদশাহ্ হওয়া সত্ত্বেও নিতান্ত সাদাসিধাভাবেই নিজের মেয়ের বিবাহ দিয়াছেন। প্রথমে আবুবকর ছিদ্বীক (রাঃ) ছয়ূরের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন। তারপর ওমর ফারুক (রাঃ) দরখাস্ত করিয়াছেন। কিন্তু ছয়ূর দোনো ক্ষেত্রেই মেয়ের বয়স কম বলিয়া ওয়র করিয়াছেন। তারপর ছিদ্বীক ও ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহুমা উভয়ে মিলিয়া হযরত আলী (রাঃ)-কে দরখাস্ত করিতে বলিলেন। হযরত আলী (রাঃ) লজ্জাবনত অবস্থায় যখন ছয়ূরের নিকট দরখাস্ত করিলেন, তৎক্ষণাৎ জিবরায়ীল মারফৎ ছয়ূরের নিকট আল্লাহ্র তরফ হইতে ওহী আসিল। ছয়ূর (দঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া নিলেন। ঐ সময় হযরত আলী (রাঃ)-এর ছিল ২১ বৎসর এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বয়স ছিল পনের কি সাড়ে পনের বৎসর।

এই হাদীস দ্বারা আমরা কতকগুলি উপদেশ পাই—(১) ছেলে এবং মেয়ের বিবাহের উপযুক্ত বয়স জানা গেল। (২) পাত্রের বয়স পাত্রীর চেয়ে কিছু বেশী হওয়া ভাল। (৩) পাত্র এবং পাত্রীর বয়স মানানসই হওয়া উচিত। পাত্রের বয়স অনেক বেশী হইলে, পাত্রীর বাপ বিবাহ দিতে না চাহিলে তাহাকে দোষী করা যাইবে না। (৪) পাত্র যদি পাত্রীর জন্য দরখাস্ত করে, তবে তাহাতে কোন দোষ নাই।

অতএব ছয়ূর (দঃ) ঘনিষ্ঠ ছাহাবাগণকে ডাকাইয়া তৎক্ষণাৎ নিজেই খোৎবা পড়িয়া নিজেই বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। ছয়ূর মহর ধার্য করিলেন ৪০০ মেস্কাল (আমাদের দেশের হিসাবে আনুমানিক ১৫০ টাকা)। ছয়ূর এক খাঞ্চ খোরমা আনাইয়া বিবাহ মজলিসে উপস্থিত সকলের মধ্যে তাকসীম করিয়া (বাঁটিয়া) দিলেন এবং উম্মে আয়মানকে সংগে দিয়া পায়ে হাঁটাওয়া দোনো জাহানের শাহজাদী মা ফাতেমাকে হযরত আলীর সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

এই হাদীস দ্বারা আমরা নিম্ন উপদেশগুলি পাইঃ

(১) বিবাহ গোপনে হওয়া চাই না; বরং খাছ ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের মজলিসে হওয়া চাই।

(২) মহর অনেক বেশী হওয়া চাই না। কারণ, ছয়ূর (দঃ) দোনো জাহানের বাদশাহ্ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার নিজের মেয়ের মহর অনেক বেশী করেন নাই।

(৩) বিবাহের মজলিসে কিছু মিষ্টিমুখ করা সুমত। (কিন্তু সামর্থ্যের অতিরিক্ত কখনো করা চাই না)।

(৪) দুলহা-দুলহানকে পায়ে হাঁটাওয়া পাঠানে কোন দোষ নাই। অবশ্য আবশ্যিকবোধে সওয়রী ব্যবহার করাতেও দোষ নাই। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে পাক্কীর ব্যবস্থাকে অত্যন্ত জরুরী বলিয়া মনে করাটা ভুল।

(৫) মেয়ের সঙ্গে—যেহেতু নূতন বাড়ী, নূতন ঘর—একজন বে-তাকাল্লুফ সঙ্গিনী—যাহার সহিত সে মন খোলাভাবে কথা বলিতে পারে—পাঠান সুমত।

অতঃপর সন্ধ্যাবেলায় ছয়ূর (দঃ) নিজে হযরত আলীর বাড়ীতে গেলেন। মা ফাতেমাকে আদেশ করিলেন, কিছু পানি আন। মা ফাতেমা নিজেই পানি আনিলেন। এর দ্বারা বুঝা গেল, নূতন বৌর নিজ হাতে কাজ করাতে কোনই দোষ নাই। দোজাহানের শাহজাদী যদি নূতন বৌ অবস্থায় নিজ হাতে কাজ করিতে পারেন, তবে অপরের সম্বন্ধে কোন কথাই আসিতে পারে না। তারপর ছয়ূর (দঃ) সূরা-ফালাক এবং সূরা-নাস পড়িয়া নিজের লোয়াব মোবারক পানির মধ্যে দিয়া মা ফাতেমার মাথায়, বুকে ও মুখে কিছু পানি নিজ হাতে ছিটাওয়া দিলেন, এবং এইরূপ

দোঁ'আ করিলেন—“হে খোদা! ফাতেমাকে এবং তাহার সন্তানকে শয়তান থেকে রক্ষা করিও।” তৎপর মা ফাতেমার পিঠের দিকেও কিছু পানি ছিটাইয়া দিলেন এবং উপরোক্তরূপ দোঁ'আ করিলেন। তারপর তাঁহাকে কিছু পানি পান করিতে এবং ঐ পানির দ্বারা ওয়ূ করিতেও বলিলেন। ইহার পর হযরত আলীকেও পানি পান করিতে বলিলেন। সেই পানিতেও তিনি উপরি-উক্তরূপ দোঁ'আ করিয়া দিলেন, এবং তাঁহারও বুকে, মুখে ও পিঠের দিকে পানি ছিটাইয়া দিয়া দোঁ'আ করিলেন এবং তাঁহাকে ঐ পানি দ্বারা ওয়ূ করিতে ও উহা পান করিতে বলিলেন; এরপর বলিলেনঃ যাও, বিস্মিল্লাহ্ বলিয়া আরাম কর।

সম্ভবপর হইলে মেয়ে-জামাইর জন্য এরূপ আমল করা সুন্নত।

এই বিবাহে নবী (দঃ) জেহিয দিলেন—(১) দুইটি চাদর, (২) দুইটি তোষক, বিছানা, (৩) ৪টি বিভিন্ন রকমের বালিশ, (৪) দুইটি বাজুবন্দ জেওর, (৫) ১টি কশ্বল, (৬) ১টি পেয়াল, (৭) এক জোড়া আটা পিষার য়াঁতা বা চাক্কি, (৮) ১টি পানি আনার মশক, (৯) ২টি পানি রাখার কলসি এবং (১০) একখানা পালঙ্ক। মোট এই কয় পদের জিনিস হযরত নবী (দঃ) জেহিয স্বরূপ দিয়াছিলেন, যাহার দ্বারা একটি নূতন পরিবার গঠন করার সাময়িক কাজ চলিতে পারে।

হযরত আলী (রাঃ)-এর একটি জেরা ছিল, তিনি উহা বিক্রয় করিয়া মহরের টাকা পরিশোধ করিলেন। মহর জেওর মেয়েদের মর্যাদার সম্পদ। কাজেই উহা পরিশোধ করা একান্ত দরকার। উহার দ্বারা বুঝা গেল যে, মেয়ে-জামাইকে জেহিয দেওয়া সুন্নত। কিন্তু অবস্থা বা সঙ্গতির অতিরিক্ত আড়ম্বর করা, অথবা ঋণ করা বা ভিক্ষা করিয়া আড়ম্বর বা ধুমধাম করা শরী'অত-বিরুদ্ধ।

তারপর ছযূর (দঃ) মেয়ে-জামাইর বাড়ীর কাজ ভাগ করিয়া দিলেন। বাড়ীর বাহিরের সব কাজ হযরত আলীর জিন্মায় এবং বাড়ীর ভিতরকার যাবতীয় কাজ মা ফাতেমার জিন্মায় দিলেন।

হাদীস শরীফে আছেঃ মা ফাতেমা নিজ হাতে য়াঁতায় আটা পিষিতেন, নিজ হাতে রুটি পাকাইতেন, নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু দিতেন। নিজে কুয়া হইতে পানি তুলিয়া মশকে করিয়া পানি আনিতেন এবং নিজ হাতে কাপড় কাচিতেন।

আজকাল আশরাফ-আতরাফের একটি কু-প্রথা আমাদের দেশে চলিতেছে। আশরাফদিরা বাড়ীর ভিতরকার কাজও করিতে চায় না; কাজ করাকেই তাহারা অপমান মনে করে। উপরোক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, কাজ করিতে কোনই অপমান নাই। যিনি সমস্ত আশরাফদের বড় আশরাফ তিনিও নিজ হাতে কাজ করিয়াছেন, নিজ হাতে আটা পিষিয়াছেন। আরব দেশের আটা পিষা আমাদের ধান ভানিয়া চাউল করারই সমান। কোন কোন অঞ্চলে ধান ভানাকে শরাফতের খেলাফ বা অপমান মনে করে, ইহা ভুল ধারণা।

কাজ করতে হাত-পা শক্ত হইয়া যায়, কাপড় ময়লা হইয়া যায়—এজন্য হযরত আলীর অনুরোধে মা ফাতেমা ছযূরের কাছে কাজের সাহায্যের জন্য দাসী চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ছযূর (দঃ) নিজের কলিজার টুকরার জন্য নিজ হাতে কাজ না করা পছন্দ করেন নাই; আর দাসী-ব্বাদীও মঞ্জুর করেন নাই; বরং নিজ হাতে সারাদিন কাজ করার পর ৩৩ বার سبحان الله ৩৩ বার الحمد لله এবং ৩৪ বার الله اكبر বলিয়া আল্লাহর শোকর গোজারী করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মা ফাতেমা এবং হযরত আলী (রাঃ) এই উপদেশ অনুযায়ী জীবনভর চলিয়াছেন।

‘শবে-যোফাফে’র পর (বিবাহের পর প্রথম মিলনের রাত্তিকে ‘শবে যোফাফ’ বলে।) হযরত আলী ওলিমা করিয়াছেন। শাদীর পর ওলিমা করা সুন্নত, তবে ওলিমার ব্যাপারেও অবস্থা হিসাবে

ব্যবস্থা হওয়া চাই। অবস্থার অতিরিক্ত অযথা ধুমধাম, অতিরিক্ত অপব্যয় বা ফখরের জন্য কোনরূপ খানা-পিনা হওয়া চাই না বা ঋণ গ্রহণ করিয়াও কোন আড়ম্বর করা চাই না। চাপ দিয়া বা জোর যুলুম করিয়াও কোন দাওয়াত আদায় করা চাই না। বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে সীমার মধ্যে থাকিয়া অবস্থা অনুযায়ী কিছু পরিমাণ শরীঅত সম্মত আমোদ-উৎসব করাতে দোষ নাই; বরং সুমত।

বাদ্য-বাজনা, নৃত্য-গীত (গান) বা বায়স্কোপ-সিনেমা কোনক্রমেই হওয়া দুরূহ নহে। আর যে কাজ ফরয, ওয়াজিব নহে, তাহা যদি ছুটিয়া যায়, তবে সেজন্য আত্মীয়-এগানার মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হওয়া উচিত নহে। সবচেয়ে বড় জিনিস হইল মুসলমানের মনের মিল, একতা ও সৌহার্দ্য। খবরদার! কাহাকে দাওয়াত না করিলে বা কাহারও বাড়ীর হাদিয়া তোহফা পাঠাইতে ত্রুটি হইয়া গেলে, সেজন্য মনোমালিন্যের সৃষ্টি যেন না হয়। মুসলমানের দিল হওয়া চাই— স্বচ্ছ পরিষ্কার নির্মল ও উদার।

### একাধিক বিবাহ

সর্বঞ্জানী মহা অন্তর্যামী আল্লাহ্ তা'আলা একজন পুরুষকে অধিকার দিয়াছেন—এক সঙ্গেই চারিজন স্ত্রী রাখিবার। আল্লাহ্ প্রদত্ত এই শর্তহীন অধিকারকে খর্ব বা নিষিদ্ধ করার বা ইহার উপর কোন শর্ত আরোপ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। এক বিবাহ করিলে যেমন সেই স্ত্রীর ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর ফরয হয় এবং সে উহা পালন করিতে বাধ্য হয়; কিন্তু যদি কেহ সেই ফরয পালনে ত্রুটি করে, তবে সে কারণে তাহাকে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। তাহার বিবাহকে নিষিদ্ধ বা শর্তাধীন করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে একাধিক বিবাহ করিলেও বিবিদের মধ্যে সকল বিষয়ে সমতা রক্ষা করিয়া তাহাদের ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করা স্বামীর উপর ফরয হয় এবং সে ফরয পালন করিতেও স্বামী বাধ্য হয়। কিন্তু যদি কেহ উক্ত ফরয প্রতিপালনে ত্রুটি করে, সে ত্রুটির কারণেও তাহাকে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। অথচ সে কারণে তাহার বিবাহকে নিষিদ্ধ বা শর্তাধীন করা যাইতে পারে না। বহু পয়গম্বর (আঃ) বহু ছাহাবী (রাঃ) এবং বহু ওলীয়ে কামেল (রাঃ) একাধিক বিবাহ করিয়াছেন—দুনিয়াতে আল্লাহর বান্দার ও নবীর উন্মত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং বিবিগণের মধ্যে যথাবিহিত সমতা রক্ষা করিয়াছেন।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, আজকাল একদল দুর্বলচেতা হীনমন্য লোক ইউরোপ আমেরিকার লজ্জাকর কুপ্রথার ভক্ত সাজিয়া, একাধিক বিবাহকে দূষণীয় মনে করে। কিন্তু নির্লজ্জ লম্পটের মত গণ্ডায় গণ্ডায় উপপত্নী বা গার্লস-ফ্রেন্ড রাখিতে কুষ্ঠাবোধ করে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইহারাই নিজেদের লজ্জা ও নোংরামী ঢাকিবার জন্য আমাদের দুর্বলচেতা, ধর্মে অনভিজ্ঞ যুবকদিগকে এই বলিয়া উপহাস করিতে চেষ্টা করে যে, তোমাদের মধ্যে একাধিক বিবাহের মধ্যযুগীয় কুপ্রথা এখনো চালু আছে। বস্তুতঃ ইহারা অন্ধ হইয়া গিয়াছে, ইহা বুঝিবার তাহাদের শক্তিই নাই। ইহা মধ্যযুগীয় কুপ্রথা নহে, ইহা আল্লাহর দেওয়া, মানুষের জন্য চিরমঙ্গলময় নীতি। ইহা কোরআনে বিবৃত হইয়াছে এবং নবীগণ কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয়, অধুনা উপরি-উক্ত ইউরোপীয় নির্লজ্জ নীতির একদল অন্ধ পূজারী আমাদের মুসলমান সমাজে দেখা দিয়াছে। তাহারা একাধিক বিবাহকে আইন বিরুদ্ধ বা শর্তসাপেক্ষ বলিয়া সাব্যস্ত করিতে চাহিতেছে। ইহা খৃষ্টানী প্রভাব এবং তাহাদের অন্ধ অনুকরণ বৈ আর কিছুই নহে।

## বাল্য বিবাহ

বাল্য বিবাহ বিরুদ্ধসাহিত করিবার জিনিস, বে-আইনী সাব্যস্ত করিবার জিনিস নহে। কারণ, বাল্য বিবাহের দুইটি দিক আছে—একটি উপকারিতার, অপরটি অপকারিতার। উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শরী'তে মোকাদ্দাসা ইহাকে হারাম বা বে-আইনী সাব্যস্ত করে নাই; বরং একান্ত জরুরতবশতঃ যে করা যাইতে পারে, তাহারই আমলী নমুনা দেখানের জন্য স্বয়ং নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাল্য বিবাহ করিয়াছেন। বাল্যকালে বিবাহ না করা হইলে বাস্তবিকই অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষতি হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। সেই সব ক্ষেত্রে বাধ্য হইয়াই বাল্য বিবাহ করাইতে হয়।

আর একটি কথা এই যে, দেশে ইচ্ছাকৃত যেনা ব্যভিচার দূরীকরণের জন্য কোন আইন বা শাস্তি নাই। যে দেশে যুবক-যুবতীদের একত্রে উঠা-বসা বা মেলামেশা প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা নাই, যে দেশে ১৩/১৪ বৎসরের মেয়েরা প্রায়ই যৌবন প্রাপ্ত হয়, সে দেশে যদি ২৬ বৎসরের কম বয়সে বিবাহ দেওয়া বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হয়, সে দেশের সতীত্বরত্ন যে কিভাবে লুপ্তিত ও অপহৃত হইবে তাহা চিন্তা করিতেও চিন্তাবিদগণের শরীর শিহরিয়া উঠে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশের একদল দুর্বলচেতা যুবক পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের মোহে মত্ত হইয়া বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে নাক সিটকাইতেছে। কিন্তু যাহারা চিন্তাশীল এবং ধার্মিক, তাহারা চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

## তালাক

বিবাহ হয় আজীবন মিলন এবং আজীবন বন্ধুত্বের জন্য। বিচ্ছেদের জন্য কখনো বিবাহ হয় না। গোপন অঙ্গকে বার বার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে খোলা যায় না। এই জন্যই শরী'তে মোকাদ্দাসা তালাককে—أَبْغَضُ الْمُبَاهَاتِ “মুবাহ্ কাজসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য” বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা যত জিনিসকে আইন অনুমোদিত করিয়াছেন, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট এবং অধিক ঘৃণ্য ও কদর্য জিনিস তালাক। হাদীস শরীফে বলা হইয়াছে, তালাক শব্দ উচ্চারণে আল্লাহ্‌র আরশ কাঁপিয়া উঠে। অবশ্য এতদসত্ত্বেও মানবীয় জরুরতের কারণে তালাকের আইনগত অনুমোদন দান করা হইয়াছে। কাজেই একান্ত ঠেকা জরুরত ব্যতিরেকে রাগের বশীভূত হইয়া বা হঠাৎ কোন ভাবপ্রবণতার বশবর্তী হইয়া তালাক দেওয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য। একান্ত জরুরতবশতঃ তালাক দিতে হইলেও এক সঙ্গে একবারে একাধিক তালাক দেওয়া শরী'তে বিরুদ্ধ। হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়াও অন্যায়। যে তোহরের (দুই হায়েযের মধ্যবর্তীকালে পাক থাকা অবস্থার) মধ্যে স্ত্রী-সহবাস করা হইয়াছে, সে তোহরের মধ্যেও তালাক দেওয়া উচিত নহে। এতগুলি শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তারপর তালাক দেওয়া সমীচীন—যদি তালাক দেওয়ার একান্তই আবশ্যিক হয়। এইসব কড়া শর্ত লঙ্ঘন করিয়া যাহারা তালাক দেয়, বাস্তবিক তাহারাই ঐ রকম পাপী যে রকম পাপী সেই অত্যাচারী ব্যক্তি, যে একজন

দুর্বল অধীনস্থ মানুষকে কামরার মধ্যে নিঃসহায় অবস্থায় পাইয়া গুলী করিয়া মারে। কিন্তু এ ব্যক্তি পাপী হওয়া সত্ত্বেও তাহার গুলীতে যেমন লোকটি মরিয়াই যায়, মৃত্যু ঠেকান যায় না, ঠিক সেইরূপে যদি কোন নির্বোধ পাপিষ্ঠ ব্যক্তি এক সঙ্গে তিন তালাক বা দুই তালাক কিংবা উপরোক্ত নিষিদ্ধ অবস্থাসমূহে তালাক দেয়, তবে সে তালাক পড়িবেই পড়িবে, স্ত্রী বিচ্ছেদ হইবেই হইবে। অতএব, সমাজের লোকদের খুব সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। তালাক যেন কোনক্রমেই দেওয়া না হয়। তালাক শব্দ মুখে আনাই মানবতার দিক হইতে ভীষণ অন্যায়। আর যদি একান্তই দিতে হয়, তবে একাধিক তালাক কিছুতেই দেওয়া চাই না। একদল লোক ব্যক্তিগত বা দলগত প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া তিন তালাক দেওয়া সত্ত্বেও সেই যালেম স্বামীকে কোনরূপ শাস্তি না দিয়া এবং শরী'অতের ব্যবস্থার দিকে না যাইয়া তাহাকেই ঐ স্ত্রী পুনরায় রাখার ব্যবস্থা দিতে চহিতেছে। ইহা তাহাদের বুদ্ধির ভুল এবং ধর্মকে বাদ দিয়া ভুল বুদ্ধির অনুবর্তিতা ও ইসলাম বিরোধী কোন এক সংখ্যালঘু দলের পক্ষপাতিত্ব ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শরী'অতে মোকাদ্দাসা তালাক দেওয়ার ক্ষমতা স্বামীকে দান করিয়াছে, স্ত্রীকে দান করে নাই।

## হিলা-শরা

আমাদের দেশে শরী'অত সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে আর একটি কু-প্রথা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। একে ত অনেকেই রাগের বশীভূত হইয়া, বগড়া কলহ করিয়া তিন তালাক এক সঙ্গে দেয়। এছাড়া মূর্খতা এত চরমে পৌঁছিয়া গিয়াছে যে, রেজিষ্টারী অফিসেও তালাক লেখাইতে হইলে এক সংগে তিন তালাক লেখায়; অথচ এক তালাক লেখাইলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া যায় এবং তিন তালাক এক সঙ্গে দেওয়ার গোনাহু হইতেও বাঁচিয়া যাইতে পারে। এক দিকে এই মূর্খতা, তারপর যখন রাগ থামিয়া যায়, আর ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি করে, তখন চৈতন্য হয় এবং চেষ্টা করে যে, কোন রকমে ঐ স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা যায় কি না। তখন কোন নিম-মোল্লা হয়ত এই জঘন্য পরামর্শ দিয়া দেয় যে, “মিঞা, ‘হিলা-শরা করিয়া লও। হিলা-শরা ছাড়া তুমি ঐ স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পার না।” “হিলা-শরা কাহাকে বলে?”—প্রশ্ন করিলে নিম-মোল্লা তখন বলিয়া দেয় যে, এমন কাহাকেও ঠিক করা, যে তোমার তালাক দেওয়া স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া এক রাত্রি রাখিয়া (সহবাসও করিবে) তারপর ছাড়িয়া দিবে, তখন তুমি বিবাহ করিবে। কি দারুণ মূর্খতা! একে ত হিলা শব্দের অর্থই খারাব—যাহাকে আমাদের সোজা বাংলায় বলা যাইতে পারে, বজ্জাতি, চালাকি বা দুষ্টামী। এখন খারাব শব্দকে আবার নেছবত করা হয় শরার সাথে। এহেন জঘন্য প্রথাকে সর্বতোভাবে বর্জন করা দরকার—ইহা বড়ই লজ্জার কথা। বর্জনের উপায় এই নহে যে, তিন তালাক এক সঙ্গে দিলে মাত্র এক তালাক পড়িবে। (কেননা, ইহাতে তিন তালাক দেওয়ার সংখ্যা ত আরো বাড়িয়া যাইবে। তাহা ছাড়া শরী'অতের বরখেলাফ ত হইবেই।) বর্জনের উপায় এই যে, প্রথমতঃ, যে কেহ এক সঙ্গে তিন তালাক দিবে, তাহাকে শাস্তি দিতে হইবে। (অবশ্য ঐ তালাকের ফলে তাহার বিবি ত হারাম বায়েন মোগাল্লাযা হইয়া যাইবে।) দ্বিতীয়তঃ যে পাপী হিলা-বাহানার পরামর্শ দিবে, যাহারা ইহাতে সংশ্লিষ্ট থাকিবে এবং যে এইরূপ বিবাহ করিবে, তাহাদের সকলকেই কঠোর শাস্তি দিতে হইবে। হাদীস শরী'ফে এক সঙ্গে তিন তালাকদাতাকে কতলের পর্যন্ত ধমকি দেওয়া হইয়াছে। এছাড়া তাহাকে আল্লাহর কিতাবের সঙ্গে উপহাসকারীও বলা হইয়াছে। আর হিলা বাহানায় যে কেহ চুক্তি করিয়া বিবাহ করিবে অথবা

করাইবে, উভয়ের উপরই আল্লাহর লা'নত (অভিশাপ) বর্ষিত হইবে বলিয়া হাদীসে উল্লেখ আছে। কাজেই আইনত এদের শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে তিন তালাকের জঘন্যতা এবং কঠোরতা বর্ণনার জন্য এই বলিয়াছেন যে, স্ত্রী পুনরায় গ্রহণ করার জন্য তালাক হয় মাত্র দুইটি। তারপর হয় স্ত্রীকে শরী'অত মোতাবেক রাখিতে হইবে, নতুবা সদ্যবহারের সঙ্গে পরিষ্কার ছাড়িয়া দিতে হইবে। পরিষ্কার ছাড়াটা হইবে তৃতীয় তালাক। যদি কেহ অবাঞ্ছিত এবং নিশ্চিন্ত হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় তালাক দিয়া ফেলে অথবা যদি কেহ জঘন্য হওয়া সত্ত্বেও এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়া ফেলে—যে কোন প্রকারেই হউক না কেন, যদি তিন তালাক দিয়া ফেলে, তবে সেই স্ত্রী আর তাহার জন্য কস্মিনকালেও হালাল হইবে না—যে পর্যন্ত না ঐ স্ত্রী এই স্বামী ছাড়া অন্য স্বামীকে বিবাহ না করিবে; তারপর যদি দ্বিতীয় স্বামী (কোন দিন) স্বেচ্ছায় ঐ স্ত্রীকে তালাক দিয়া বসে এবং তারপর যদি পূর্ব স্বামীও এই স্ত্রীকে পুনর্বিবাহ করে, তবে তাহাতে তাহাদের গোনাহ হইবে না—যদি তাহারা আল্লাহর সীমা ঠিক রাখে; আর যাহারা আল্লাহর সীমা লংঘন করিবে তাহারা হইবে যালেম।

আইনের উদ্দেশ্যকে সফল হইতে না দিয়া যাহারা শুধু আইনের ফাঁক তালাশ করিয়া বেড়ায়, তাহাদের জন্যই বলা হইয়াছে—যাহারা আল্লাহর সীমা লংঘন করিবে, তাহারা যালেম সাব্যস্ত হইবে।

এই আয়াতের দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, তিন তালাক হইয়া গেলে সেই স্ত্রী আর পুনরায় গ্রহণ করা যাইবে না। অবশ্য ইদত পার হওয়ার পর, বিনা চুক্তি বা বিনা কথাবার্তায় এমনিই ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিবাহ করিলে সেই স্বামী যদি কোন দিন তাহাকে তালাক দিয়া দেয় বা সে মরিয়া যায়, তাহা হইলে সেখানের ইদত পার হওয়ার পর পুনরায় পূর্ব-স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের সম্মতিতে পুনর্বিবাহ হইলে তাহাতে অবশ্য তাহারা গোনাহগার হইবে না।

### পর্দা রক্ষা করা ফরয

স্ত্রীলোকের সতীত্ব এবং পুরুষের চরিত্র রক্ষা করা এত বড় ফরয যে, এই ফরয সর্বপ্রথম পয়গম্বর হযরত আদম আলাইহিসসালাম হইতে আরম্ভ করিয়া আখেরী পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল শরী'অতেই ফরয রহিয়াছে। আমাদের নবী যেহেতু শেষ পয়গম্বর, যেহেতু তাঁহার শরী'অতই সর্বশেষ এবং সর্বব্যাপী শরী'অত, যেহেতু মেয়েলোকের সতীত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যবান এবং অধিক লোভনীয় রত্ন—দুর্বলের নিকট গচ্ছিত; এইজন্য লোকেরা যেমন তাহাদের মূল্যবান রত্নকে সাত পাশ্চা লোহার সিন্দুকে হেফাযত করিয়া রাখে তদ্রূপ কোন মানুষে নয়, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার প্রেরিত প্রতিনিধি রাসূল মেয়েলোকের সতীত্বের হেফাযতের জন্য, সাত পাশ্চা লোহার সিন্দুকের ব্যবস্থা বাতাইয়া দিয়াছেন। যাহারা এই মূল্যবান রত্নকে হেফাযত করিতে চায়, তাহারা নিশ্চয়ই আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে; আর যাহারা গ্রহণ করিবে না, তাহারা নিশ্চয়ই ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

প্রথমতঃ সর্বদা ছতর ঢাকিয়া রাখার হুকুম করা হইতেছে। পুরুষের ছতর নাভি হইতে হাঁটু পর্যন্ত; মেয়েলোকদের ছতর মুখমণ্ডল, হাতের কজ্জি এবং পায়ের পাতা ছাড়া বাকী সর্ব-শরীর। কাহারো ছতর ছোঁয়া ত দূরের কথা, দূর থেকে দেখাও হারাম এবং দেখানও হারাম।



দ্বিতীয়তঃ, মেয়েলোকের শরীরের সৌন্দর্য, তৃতীয়তঃ, মেয়েলোকের জেওরের সৌন্দর্য, চতুর্থতঃ, মেয়েলোকের কাপড়ের সৌন্দর্য—এমনভাবে খোলা রাখাকে হারাম করা হইয়াছে, যাহাতে উহা অন্য পুরুষে দেখিতে পায়। পঞ্চমতঃ, মিষ্ট সুরে গান গাহিয়া পরপুরুষকে শুনান ত দূরের কথা, নরম ও কোমল স্বরে পরপুরুষের সঙ্গে কথা কহিতে পর্যন্ত মেয়েদিগকে শরী'অতে নিষেধ করা হইয়াছে। ষষ্ঠতঃ, বিশেষ জরুরতবশতঃ বাড়ীর চার দেওয়ালের বাইরে যাইতে হইলে, পথ চলার সময় পায়ের জেওরের আওয়ায যাহাতে পরপুরুষে শুনিতে না পারে, চেহারা যাহাতে পরপুরুষের দৃষ্টিগোচর না হয়, তজ্জন্য পা জোরে ফেলিতে নিষেধ করা হইয়াছে এবং বোরকা পরিয়া অথবা বড় চাদরের ঘোমটা টানিয়া মুখ ঢাকিয়া লহিতে এবং উড়নীর দ্বারা গর্দান ঢাকিয়া লহিতে আদেশ করা হইয়াছে। সপ্তমতঃ, মেয়েদের কর্মক্ষেত্র বাড়ীর ভিতরে সাব্যস্ত করিয়া দিয়া পুরুষদিগকে এইরূপ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বাড়ীর ভিতরকার মেয়েলোকদের নিকট কোন জিনিস চাহিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে তাহারা যেন পর্দার বাহিরে বা আড়ালে থাকিয়া উহা চাহে। এই সাতটি বিধান পরিষ্কার ভাষায় কোরআন এবং হাদীসে বর্ণিত আছে। ইহার একটি কথাও কোন মানুষের গড়ান নয়। অতএব, এগুলি প্রথা নয়, অপরিহার্য ফরয এবং ওয়াজিব।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিসসালামের শরী'অত, হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর শরী'অতে উপরি-উক্তরূপ কড়া ব্যবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা ছিল না। কাজেই কোরআন-হাদীসের বিধান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, খৃষ্টান ইংরেজদের প্রভাবে যাহারা প্রভাবিত হইয়াছে, তাহারাই খৃষ্টান মিশনারীদের প্রবঞ্চনার শিকারে পরিণত হইয়া ইসলামের চির সুন্দর ব্যবস্থার প্রতি 'খাঁচায় আটকাইয়া রাখা, সিন্দুকে ভরিয়া রাখা, পুরুষের একচেটিয়া আধিপত্যের সুযোগ করা, ইত্যাদি ব্যঙ্গোক্তি করিয়া আমাদের ধর্মে অনভিজ্ঞ, মনস্তত্ত্বে অনভিজ্ঞ যুবক-যুবতীদের প্রথমতঃ আল্লাহর ফরয-কৃত পর্দাকে লঙ্ঘন করাইয়া পরিশেষে সতীত্ব হরণেরও বিরাট সুযোগ করিয়া লইয়াছে। কাজেই এখনো সনির্বন্ধ অনুরোধ করি, হে মুসলমান ভাই-ভগ্নিগণ! এখনো ধর্মে ফিরিয়া আসুন। আর ইতর প্রাণীর ন্যায় উচ্ছৃংখল জীবনের দিকে যাইবেন না; ভ্রমরের মত এ-ফুলের সৌরভ লুটিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেন না।

## ভোরে গাত্রোথান

পূর্বকাশে রাত্রিশেষে সূর্যের আগমনবার্তা বহন করিয়া যখন প্রথম সাদা ভাব দেখা দেয়, তখনকার সময়টা বড়ই পবিত্র সময়। এই সময়কার হাওয়া বড় পবিত্র হাওয়া। এই হাওয়া গায়ে লাগাইলে মনে স্মৃতি ও ভাল স্বাস্থ্য লাভ হয়। এই পবিত্র ও মহোপকারী মুহূর্তে কাহারো বিছানায় ঘুমাইয়া থাকা উচিত নহে। সকাল সকাল ঘুম হইতে উঠিয়া আল্লাহর নাম উচ্চারণ করিয়া 'আউযুবিল্লাহ্' 'বিসমিল্লা' কলেমা এবং দো'আ পড়িয়া পেশাব-পায়খানা প্রভৃতি হইতে সারিয়া মসজিদে গিয়া জমা'আতে ফজরের নামায পড়া এবং খোদার কাছে সারাদিনের কামিয়াবীর জন্য দো'আ চাওয়া প্রত্যেক মুসলমানেরই একান্ত কর্তব্য।

দুঃখের বিষয়, আজকাল বিধর্মীদের কু-সংসর্গে পড়িয়া অনেক মুসলমান ছেলেদের মধ্যেও এইরূপ রোগ ঢুকিয়াছে যে, তাহারা সকালে গাত্রোথান করে না; বরং সূর্যোদয়েরও অনেক পরে বেলা ৮/৯ টায় ঘুম হইতে উঠে। ইহা অত্যন্ত খারাব অভ্যাস। যাহার মধ্যে এই কু-অভ্যাসের

বিষবাস্প ঢুকিয়াছে, অতি যত্ন ও চেষ্টা সহকারে যথাশীঘ্র সম্ভব তাহার এহেন গর্হিত কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করা দরকার।

### কোরআন শরীফ তেলাওয়াত

প্রত্যেক মুসলমানেরই—চাই সে ইউরোপে থাকুক বা আমেরিকায় থাকুক—স্বদেশে বা বিদেশে যেখানেই থাকুক না কেন—সকালে উঠিয়া ফজরের নামায পড়িয়া আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কোরআন শরীফ হাতে লইয়া চুমা দিয়া চোখে মুখে লাগাইয়া কিছুক্ষণ অতি মনোযোগের সহিত অতীব ভক্তি সহকারে কোরআন তেলাওয়াত করা দরকার। যদি অর্থ বুঝিয়া তরজমা দেখিয়া তেলাওয়াত করা যায়, তবে ত খুবই ভালো; নতুবা অন্ততঃপক্ষে আল্লাহর দিকে দেল রুজু করিয়া ভক্তির সঙ্গে কোরআন শরীফের শব্দগুলি পড়িলেও অনেক আধ্যাত্মিক (রূহানী) উন্নতি সাধিত হয়। অর্থ না বুঝিলেও এতটুকু কথা সকলেরই বুঝে আসে যে, আমি আল্লাহকে ভক্তি করিয়া আল্লাহর কালাম পাঠ করিতেছি। প্রাথমিক অবস্থায় এই মৌলিক ভক্তির বড় অর্থ, তারপর ক্রমাগতই বিস্তারিত অর্থ বুঝিবার জন্য চেষ্টা করা দরকার। অর্থ না বুঝিয়া পড়িলেও কোরআন পাকের প্রতিটি হরফে এই ভক্তির কারণে আল্লাহ পাক দশ-দশটি নেকী পুরস্কার দিবেন। আর অর্থ বুঝিয়া ভক্তি, চিন্তার সঙ্গে পড়িলে আরো অনেক বেশী নেকী দিবেন। আর মানব জীবনে নেকীই পরম কাম্য, পরম সম্পদ—আখেরাতের সওদা কিনিবার জন্য ইহাই একমাত্র মুদ্রা।

### মেয়েদের কয়েকটি কুপ্রথা

আজকাল এইরূপ একটি কুপ্রথা চালু হইয়াছে যে, হিন্দুদের দেখাদেখি মুসলমান মেয়েদের কপালেও সিন্দুরের ফঁোটা দেওয়া হয়। ইহা অতি জঘন্য কুপ্রথা—বিজাতীয় অনুকরণ। ইহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। মুসলমান মেয়েদের বিশিষ্ট লেবাস কোর্তা, পায়জামা, উড়নী, চাদর বোরকা প্রভৃতি হওয়া দরকার—যাহাতে মুসলমান বলিয়াই চেনা যায়। অন্য জাতির কোন আলামত মুসলমান মেয়েদের মধ্যে বা পুরুষদের মধ্যে কোনক্রমেই হওয়া চাই না।

আজকাল আর একটি ঘৃণ্য প্রথা চালু হইয়াছে যে, যে-সব মেয়েরা হায়া-লজ্জাকে ত্যাগ করিয়া একেবারে ইতর পশু সাজিতেছে, তাহারা বুক উঁচু করিয়া রাখে। ইহা অত্যন্ত জঘন্য প্রথা। স্ত্রীলতা, ভদ্রতা ও মানবতার অনুভূতি যার মধ্যে বিন্দুমাত্রও আছে, যার মধ্যে বিন্দুমাত্র ঈমান বিদ্যমান আছে, সেই নারী এরূপ কিছুতেই করিতে পারে না। বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে যাইতে হইলে এমন অবস্থায় বাহির হইবে যাহাতে পুরুষদের মধ্যে যৌন প্রেরণা বা উত্তেজনার সৃষ্টি না করে।

আমাদের শরীঅতে মোকাদ্দাসার মহান পবিত্র বিধান অনুসারে হায়া-শরম মানবীয় মহৎ গুণাবলীর মধ্যে একটি প্রধান গুণ। ইহা ঈমানের একটি বিশেষ অঙ্গ। এই গুণকে অর্জন করা দরকার। অন্যান্য ধর্মের লোকদের অনুকরণে বা ধর্মহীনদের দেখাদেখি নির্লজ্জতা এবং বেহায়ায়ীমূলক আচরণ, চলাচলও কোনক্রমেই উচিত হইবে না। মানুষের মধ্যে ও হায়াওয়ানের মধ্যে বড় পার্থক্য এই যে, হায়াওয়ানের মধ্যে শরম নাই। আর হায়া-শরম মানুষের বিশিষ্ট অলঙ্কার। ইহা কোন প্রকারের সংস্কার বা লৌকিক প্রথা নহে। ইহা পরম সত্য, নবী-বাণী খোদার ওহী দ্বারা প্রমাণিত সত্য।

## বগলের ও নাভির নীচের পশম

যে নছার জাতির ওস্তাদ শাগরেদরা এক জায়গায় উলংগ হইয়া গোসল করিতে লজ্জাবোধ করে না, যাহারা স্কুল-কলেজের বারান্দায়, অলিগলিতে বা রাস্তায় পার্কে পাশবিক ব্যভিচার করিতে লজ্জাবোধ করে না, সেই সকল সভ্যতার নিশানধারী অসভ্যদের অনুকরণে আমাদের মধ্যেরও একদল বগলের পশম লম্বা করিয়া রাখাকে সভ্যতা ও ভদ্রতা (?) বলিয়া মনে করে। ধিক! শত ধিক! এমন নোংরা সভ্যতাকে! আমাদের মহান শরী'অতের হুকুম হইতেছে এই যে, বগলের পশম উপড়াইয়া বা মুণ্ডাইয়া বগল পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে; এইরূপে নাভির নীচের পশমও মুণ্ডাইয়া বা লোমনাশক লাগাইয়া স্ত্রী-পুরুষের উভয়েরই পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে—যেন এক ধান পরিমাণ অপেক্ষাও লম্বা হইতে না পারে।

### কুঅভ্যাস শুরু হইতেই বর্জন করা উচিত

কোন পাপীই একদিনে বা প্রথমেই বড় পাপী হয় না। উত্তরকালে যে বড় চোর হইয়াছে, সে হয়ত প্রথমে লোভের বশবর্তী হইয়া সামান্য একটা বরই বা একটা আম চুরি করিয়াছিল। পরে এইভাবে চুরি করিতে করিতে ক্রমাশয়ে বড় চোর হইয়াছে, ফলে ইসলামী হুকুমতের অধীন হইয়া থাকিলে সে জেলে গিয়াছে বা তাহার হাত কাটা গিয়াছে। এইরূপে বড় অত্যাচারী প্রথমেই আর বড় অত্যাচারী থাকে না, বড় ব্যভিচারী থাকে না, তবে দুনিয়াতে এমন কতক লোক আছে, যাহারা ভাল হইতেই চায় না; তাহাদিগকে কেহ ভাল করিতে পারিবে না, যাহারা ভাল হইতে চায়, তাহাদের জন্যই বলেতেছি যে, আগে থেকেই হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে। ছেলেপিলেদের প্রতি তাহাদের মা-বাপ ও মুরকিবয়ানদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে—যাহাতে ছেলেপিলেদের ভিতর কোনরূপ কুঅভ্যাস না ঢুকিতে পারে। চুরির অভ্যাস, অত্যাচারের অভ্যাস, মিথ্যার বা পরনিন্দার অভ্যাস যাহাতে তাহাদের মধ্যে না ঢুকিতে পারে সেজন্য সর্বক্ষণ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সাধারণতঃ দেখা যায়, কুসংসর্গের কারণেই কু-অভ্যাস ঢুকে। কাজেই এই কুসংসর্গ হইতে ছেলেপিলেদিগকে দূরে রাখার জন্যে সর্বদাই কড়া নজর এবং চেষ্টা রাখিতে হইবে। বিশেষ করিয়া ছেলেমেয়েরা যখন যৌবনের কাছাকাছি পৌঁছে তখন ত ২৪ ঘন্টাই কড়া দৃষ্টি রাখা দরকার, যাহাতে যৌন উচ্ছুংখলার লেশমাত্রও ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোনক্রমে প্রবেশ করিতে না পারে। কারণ একদিকে যৌন উচ্ছুংখলতার মত খারাব জিনিসও যেমন নাই, তেমনি অপর দিকে ইহার মত মজার জিনিসও আর নাই, কাজেই খুব বেশী সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

অনেক ভাল লোকও অনেক সময় আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে কুসংসর্গে জড়িত হইয়া দুনিয়া আখেরাত বরবাদ করিয়া বসে। কোন ওস্তাদ হয়ত কোন মেধাবী বালক বা বালিকাকে প্রথমতঃ ভাল নিয়তে ভালবাসে। কিন্তু পরে কাম-রিপূর উত্তেজনাকে দমন করিতে পারে না। ক্রমে ক্রমে খারাব কাজে জড়িত হইয়া পড়ে। ভাবী প্রথমতঃ হয়ত ভাল নিয়তেই ছোট দেওরকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে ও ভালবাসে। কিন্তু পরিশেষে খারাব কাজে জড়িত হইয়া পড়ে।

ভগ্নিপতি হয়ত প্রথম প্রথম ভাল নিয়তেই ছোট শালীকে ভালবাসে। কিন্তু ক্রমাঘয়ে অবৈধ কাজে জড়িত হইয়া পড়ে। মামী হয়ত ছোট ভাগিনাকে ভাল নিয়তেই ভালবাসে; কিন্তু পরে অন্যায় কাজে জড়িত হইয়া পড়ে। এই ধরনের কথা আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতেছি, এবং সকল ভাইকে হুঁশিয়ার করিয়া দিতেছি যে, সকলেরই আগে হইতে হুঁশিয়ার হইয়া সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। এই জন্যই শরীঅতের বিধান আছে যে, বালিকা ত দূরের কথা, শালী দেওর ত অনেক বড় কথা, দাড়িহীন বালক দ্বারাও কোনরূপ শারীরিক খেদমত লওয়া উচিত হইবে না; তাহাকে একাধিকবার নির্জন কামরার কাছে আসিতে দেওয়া বা তাহার দিকে নজর করাও কঠোর হরাম।

## সহশিক্ষা

খৃষ্টান বর্বরতা বনাম সভ্যতার প্রভাবে আমাদের দেশে স্কুল কলেজে সহশিক্ষা প্রথা (বালক-বালিকা ও নারী-পুরুষের এক সঙ্গে পড়া) চালু হইয়া পড়িয়াছে। একদল পরানুকরণপ্রিয় লোক ইহাকে পছন্দ ও চালু করিতেছে। ইহা অতি জঘন্য প্রথা, ইহার বিষ-ফল অতি ভয়াবহ। প্রত্যেক মুসলমানেরই কঠোরভাবে ইহার বিরোধিতা করা একান্ত দরকার।

## বিভিন্ন নামে বিভিন্ন প্রকার জুয়া

সহশিক্ষার ন্যায় খৃষ্টানী প্রভাবের কারণে পরানুকরণ প্রিয়তার দোষে এবং ধর্মশিক্ষার অভাবের সুযোগ লইয়া আমাদের দেশে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন প্রকারের জুয়া এবং সুদ ছড়ান হইতেছে; যাহাতে তিল তিল করিয়া ইসলামী সভ্যতাকে পরাভূত করা যায়।

গেট-এ-ওয়ার্ড (Get-e-word) নামে, হর্সরেস্ নামে, জীবন বীমা বা লাইফ ইন্সুরেন্স নামে প্রভৃতি জুয়া ছড়ান হইতেছে। তাহারা বলে, সুদ ছাড়া ব্যাংক চালান যায় না এবং ব্যাংক ছাড়া কারবার তথা গোটা দেশ রাষ্ট্র চালানই অসম্ভব। কিন্তু তাহাদের এ দাবী সম্পূর্ণ অমূলক ও মিথ্যা। তাহারা নিজেদের সৃজনী শক্তি না খাটাইয়া পরের দেখাদেখিই এইভাবে দেশে সুদ ছড়াইতেছে। ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলিতেছেন, সুদ ছাড়া ব্যাংক চালান যায়। কিন্তু সে দিকে তাহারা ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না। অতএব, যাহাদের দিলে ইসলামী দরদ আছে, ইসলামী সভ্যতাকে ইসলামী বিধি-বিধানকে জিন্দা রাখার ফরযিয়াতের অনুভূতি এখনো যাহাদের নির্জীব হইয়া পড়ে নাই, তাহাদের এই ধরনের খৃষ্টানী বর্বরতার বিরোধিতা করা একান্ত দরকার।

## কু-চিকিৎসা

এইরূপে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নামেও আমাদের ছেলেদিগকে ইউরোপ আমেরিকার এজেন্টগিরি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং তাহাদিগকে ডাক্তার নামে অভিহিত করিয়া তাহাদের দ্বারা জনসাধারণের শুধু যে, পয়সা লুটিয়া নিয়া তাহাদিগকে নিঃস্বই করা হইতেছে তাহা নহে; বরং তাহাদের দৈহিক স্বাস্থ্যও নষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে। তাহাদের মনের বল ও জ্ঞানের বল উভয়ই কমাইয়া দেওয়া হইতেছে। দরিদ্র ও সরল জনসাধারণ ঔষধের অতিরিক্ত ব্যবহুলতার কারণে এবং ডাক্তারদের দুর্ব্যবহারের কারণে বাধ্য হইয়াই সূতা পড়া, পানি পড়া বা তাবীয় তুমারের উপর নির্ভর করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে।

আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে আমাদের দেশীয় গাছ-গাছড়ার গুণাগুণ শিক্ষা দেওয়া উচিত। হেকিমী ও কবিরাজী চিকিৎসা বিজ্ঞানকে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত ছিল। এদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এব্যাপারে তাহাদের দায়িত্বজ্ঞান যত তাড়াতাড়ি উদয় হইবে, ততই জাতির পক্ষে অধিক মঙ্গলকর হইবে।

আমাদের শরী'অতে মোকাদ্দাসার বিধান অনুযায়ী চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করা ফরযে-কেফায়া এবং রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা করা সুন্নতে মোআক্কাদাহ্। কিন্তু সু-চিকিৎসা কিছুতেই হইতে পারে না, যে পর্যন্ত না চিকিৎসক যেমন একদিকে হইবেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ও শাস্ত্রে পারদর্শী, তেমনি অপর দিকে হইবেন খোদাতীরু, ধার্মিক ও সত্যবাদী, দায়িত্বজ্ঞানশীল—অন্য কথায় মানুষের সেবাই হইবে তাঁহার জীবনের ব্রত ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং তাঁহার মা'বুদ একমাত্র খোদা; অর্থের জন্য তাঁহার লালসা হইবে না বিন্দুমাত্রও।

### ওয়াযের মাহ্ফিল

ইসলামী আদর্শ, ইসলামী আহ্‌কাম, কোরআনের আদেশ-নিষেধ ও রাসূলের সুন্নত তরীকা সাধারণভাবে প্রচার করার জন্য, সমস্ত অধঃপতন ও দুর্নীতির মূল কারণ যে আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া থাকা, আখেরাতকে ভুলিয়া থাকা ও দুনিয়ার মোহে মত্ত হইয়া যাওয়া, সেই মূল কারণকে দূর করিয়া আল্লাহ্‌র মহব্বত পয়দা করার জন্য, আখেরাতের বিচার ও হিসাবকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য এবং দুনিয়ার মায়া-মহব্বত মোহমত্ততা কমানের জন্য মাঝে মাঝে ওয়াযের মাহ্ফিল করার দরকার—একান্ত দরকার।

কিন্তু শুধু সুমধুর স্বর, সুন্দর ভাষা ও মার্জিত বর্ণনা পদ্ধতি হইলেই চলিবে না; বরং যিনি ওয়ায করিবেন তাঁহার নিম্নলিখিত গুণগুলির অধিকারী হইতে হইবে—(১) আঞ্চলিক ভাষার উপর আধিপত্য এবং বর্ণনা ভঙ্গীর মাধুর্য, কোরআন হাদীসে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইবে। কোরআন হাদীসের পারদর্শী ইমামগণ কোরআন হাদীস হইতে ইজতেহাদ করিয়া যে সব মাসআলা মাসায়েল (সূত্র, ধারা উপধারা এবং তত্ত্বজ্ঞান) বাহির করিয়া ফেকাহ্, তাসাওওফ ও আক্বায়েদের কিতাব লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানে মোটাটামুটি অধিকারী হইতে হইবে। (২) আবার শুধু জ্ঞানের অধিকারী হইলেও চলিবে না; বরং তদনুযায়ী নিজ নিজ আক্বায়েদ-আ'মাল ও আখলাককেও গঠন করিতে হইবে; কথায় ও কাজে মিল থাকিতে হইবে। কুফর, শিরক ও বেদ'আত হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। নামায রোযার পূর্ণ পাবন্দ হইতে হইবে, লেবাসে ও ছুরতে-সীরাতে সুন্নতের পাবন্দ হইতে হইবে। লেনদেন পরিষ্কার রাখিতে হইবে। চালচলন আচার-ব্যবহার সুন্দর হইতে হইবে; গরীবদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে না। টাকা-পয়সার প্রতি আদৌ লোভ থাকিতে পারিবে না। দ্বীনের খাতিরে বা দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য জানের, মালের বা নিজের সম্মানের ক্ষতিরও পরওয়া করা চলিবে না। দুনিয়ার জিন্দেগীর চাইতে আখেরাতের জিন্দেগীকেই সবচেয়ে বড় মনে করিতে হইবে। আল্লাহ্‌র মহব্বত, আল্লাহ্‌র ভয় এবং নশ্ব স্বভাব এখতিয়ার করিতে হইবে। এইরূপ আলোমের ওয়াযই ইংরেজী শিক্ষিত, আরবী শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সকলেই শুনিবে। সকল রকম বক্তৃতার পিছনেই দৌড়ান ঠিক নহে।

ওয়াযের দ্বারা ধর্মের সাধারণ জ্ঞান লাভ হইবে এবং সাধারণভাবে দ্বীনদারী, পরহেযগারী ও ঈমানের মজবুতীও হাছিল হইবে। কিন্তু প্রত্যেক মুসলমানেরই দরকার আছে, খাছভাবে একজন

খাঁটি যোগ্য নায়েবে রাসূল তালশ করিয়া বাহির করিয়া তাঁহার কাজে নিজের ভিতরকার সব দুর্বলতার কথা গোপনে প্রকাশ করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাঁহার ছোহুবেতে থাকিয়া তাঁহার আদর্শ চরিত্র, আদর্শ জযবা ও আদর্শ ঈমান মোতাবেক নিজের জীবনকেও তদ্রূপ গঠন করা। আল্লাহ্র সঙ্গে মযবুত তা'আল্লোক আপনাআপনি পয়দা হয় না। শুধু কিতাব পড়িলেও হয় না বা শুধু ওয়ায শুনিলেও হয় না; বরং যোগ্য কামেল নায়েবে রাসূলের নিকট বার বার যাতায়াত করিয়া, তাঁহার কাছে থাকিয়া, বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া, নিজের ভিতরকার অবস্থাদি জানাইয়া, কিছু শয়তানের সঙ্গেও মুজাহাদা করিয়া তাঁহার প্রদত্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী আমল করিয়াই আল্লাহ্র সঙ্গে তা'আল্লোক পয়দা করিতে হয় এবং জীবনভর গুণগুলিকেই বেশী মর্যাদা দিতে হয়। আজকাল এক রকম তা'বীযের ব্যবসায়ী পীর এবং ব্যবসায়ী ওয়ায়েয বাহির হইয়াছে, যাহারা বংশানুক্রমে আয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ইহার সুন্নতের কোন পায়রবী করে না, শরী'অতেরও কোন পরওয়া করে না। এই প্রকার ব্যবসায়ী পীরদের কাছেও যাওয়া চাই না; বরং সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকিলে ধর্মের নামে এই ধরনের ধোঁকাবাজিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এই ধরনের জাল নোটই দুনিয়াতে খুব বেশী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি চেষ্টা ও যত্ন করিয়া আসল নোটের সন্ধান না করিলে, তার মর্যাদা না করিলে, সেটা হইবে ঘোর অন্যায় এবং ঘোর বোকামি। যিনি খাঁটি নায়েবে রাসূল, খাঁটি পীর হইবেন, তাঁহারও এক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ হইতে হইবে, যাহারা দ্বীনের উন্নতি চায়, নফসের এছলাহ্ করিতে চায়, আল্লাহ্র সঙ্গে তা'আল্লোক মযবুত করিতে চায়, দুনিয়ার মহব্বত কমাইয়া আখেরাতের কাজ কিছু করিতে চায়, আখলাকের উন্নতি ও চরিত্র গঠন করিতে চায়, ধৈর্য সহকারে তাহাদের জন্যও কিছু সময় দান করিতে হইবে। ইহা কোনরূপ নিছক দয়া নহে; বেকারের নামমাত্র কাজও নহে; বরং ইহা রাসূল্লাহ (দঃ)-এর সুন্নত—অতি বড় সুন্নত। ইহা না থাকিলে লোকের তালীম তরবিয়াত হইবে কেমন করিয়া? ইসলামের সেই উন্নতির যুগে বাদশাহ্-উযির, শাসক-বিচারক, শাস্তি-রক্ষক পুলিশ, বণিক, কৃষক সকলেই নিজে আলেম হওয়া সত্ত্বেও এইরূপ কামেল নায়েবে রাসূলের নিকট হইতে তরবিয়াত গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রের বা অন্যান্য কাজ চালাইতেন। ঐ শ্রেণীর আলেমগণ নিজেরা রাষ্ট্রীয় কাজে থাকিতেন না; বরং জনগণেরই খেদমত করিতেন।

বস্তুতঃ ইহাই নেযামে খানকাহীর, পীর-মুরীদীর বা তাসাওওফের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু পরে ধোঁকাবাজ ও দুনিয়া লোভীরা সব কিছুই বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু যেহেতু দ্বীন ইসলামের হেফাযতের ভার নিয়াছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা এবং যেহেতু নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন :

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي قَوَّامَةٌ عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهَا مَن خَالَفَهَا (ابن ماجه)

[ইহার সারমর্ম এই যে, আমার উম্মতবন্দ হইতে ছোট হইলেও একটি দল নিশ্চয়ই হকের উপর কায়েম থাকিবে; ধোঁকাবাজদের ধোঁকাবাজিতে, দুষ্টদের টিটকারীতে বা সাহায্য বন্ধকারীদের সাহায্য বন্ধ করাতেও তাহাদের টলাইতে বা বিগড়াইতে পারিবে না।] এইজন্য কিছু লোক হকের উপর নিশ্চয়ই আছে, কাজেই তালশ করিয়া তাহাদিগকে বাহির করিতে হইবে ও তাহাদের দ্বারা কাজ নিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সত্যিকার মহৎলোক যখন সর্বদাই ছিল, যখন খাঁটি ইসলামী খেলাফত ছিল বা সমাজ ব্যবস্থা মোটামুটি ইসলামী ছিল, তখন এই সকল লোকদের মহান মর্যাদা দান করা হইত। বস্তুতঃ এই মর্যাদা দেখিয়াই পরবর্তী যুগে একদল ধোঁকাবাজ জন্মিয়াছে। ফলে

ধোঁকাবাজদের হাতে ধোঁকা খাইয়া জনসাধারণ এখন খাঁটি অখাঁটির তারতম্য না করিয়া সকলেরই অমর্যাদা করিতে শিখিয়াছে; তবে জনসাধারণ তারতম্য করিতে শিখিলে, এই ধরনের ধোঁকাবাজদের রুযি-রোযগার বা খাওয়া পরা চলিবে কি করিয়া?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, শঠতা, প্রবঞ্চনা ও ধোঁকা দিয়া যাহারা সরল প্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে, তাহারা গোটা জাতির তথা ইসলামের—অন্য কথায় আল্লাহর শত্রু। তাহাদের রুযি-রোযগারের চিন্তায় ব্যাপ্ত হওয়া কোন মুসলমানের জন্যই জায়েয হইতে পারে না। ‘আবার এই ধোঁকার ভয়ে সত্য অসত্য বা খাঁটি অখাঁটি বাছাই না করিয়া কাহারো নিকট না গেলে, যাহারা খাঁটি আছেন তাঁহাদের রুযির অবস্থাই বা কি হইবে? এমন প্রশ্নও হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, যাহারা খাঁটি তাঁহারা রুযির জন্য কোন বান্দার উপর কখনও নির্ভর করেন না! দ্বিতীয়তঃ, মুসলমানেরা কখনো এতদূর বোকা হইতে পারে না যে, ধোঁকার ভয়ে তাহারা সত্যকে এবং খাঁটিকেও বাছাই করা এবং তাহার দ্বারা উপকৃত হওয়াকে ত্যাগ করিবে। অখাঁটিকে বাছিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে এবং যাহারা খাঁটি তাঁহাদের যথোচিত মর্যাদা দিতে হইবে।

ধর্ম রক্ষার জন্য কয়েক প্রকার ব্যবস্থা রহিয়াছেঃ (১) মক্তব, (২) মাদ্রাসা, (৩) মা'হাদ, (৪) খানকাহী তরবিয়াত, (৫) জামে'আহ, (৬) ওয়ায-নছীহতের মজলিস, (৭) তাবলীগ, (৮) তা'লীফ-তাছনীফ, (৯) তানযীম, (১০) তফসীরের মজলিস, (১১) সীরাতুন্নবীর মজলিস, (১২) দারুল-ইফতা, (১৩) দারুল-হাদীস, (১৪) রদ্দে-নাছারা, রদ্দে-কাদিয়ানী, রদ্দে-কুফর ও শেরক ও রদ্দে-কমিউনিষ্ট, (১৫) মসজিদ ইত্যাদি।

(১) মক্তব—যেখানে কায়দা, ছিপারা ও কোরআন শরীফ শুদ্ধ করিয়া পড়ান হয় এবং ধর্মের প্রাথমিক শিক্ষা বেহেশ্তী জেওর পর্যন্ত অর্থাৎ কলেমা, নামায, রোযা, ওযু-গোসল, জুমু'আর খুৎবা, জানাযার তরীকা, বিবাহের খুৎবা, মোটামুটি হালাল-হারাম, পাক-নাপাক, জায়েয-নাযায়েয ও বেহেশ্ত-দোযখের বয়ান ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়।

(২) মাদ্রাসা—যেখানে কোরআন, তফসীর, হাদীস, ফেক্হ, তাছাওওফ, আক্বা'য়েদ ইত্যাদি আরবী ভাষায় ব্যাকরণ ও মোহাবারাসহ শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৩) মা'হাদ—যেখানে তাহকীকাত (Research—গবেষণা) শিক্ষা দেওয়া হয় এবং শিক্ষক ও মোবাল্লেগদের তরবিয়াত (Training) দেওয়া হয়।

(৪) জামে'আ—যাহার অধীনে আরো অনেক মাদ্রাসা থাকে।

(৫) খানকাহ—যেখানে কোরআন হাদীসের শিক্ষাকে আমলে পরিণত করা হয় এবং তদনুযায়ী চরিত্র গঠন করা হয়।

(৬) মসজিদ—যেখানে এবাদত-বন্দেগী করা হয় এবং ইসলামী বিষয়সমূহের পরামর্শ সভা করা হয়। এই সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণ সমস্ত মুসলমানের উপর ফরয। আর হুকুমত (বা সরকার) ইসলামী হইলে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে সরকারই এইগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, যেহেতু আমাদের হুকুমত ইসলামী নয়; সেজন্য এগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার কাজে মুসলমানদের যাকাত, খয়রাত ও দানের পয়সা খরচ হওয়াই সবচেয়ে বেশী জরুরী এবং সবচেয়ে অধিক নেকীর কাজ।

## জায়গীর

দীর্ঘ দুইশত বৎসর যাবৎ ইসলামের পরম দুষমন ইংরেজগণ আমাদের দেশ শাসন করিয়া যে বিষফলের বীজ বপন করিয়া গিয়াছে তার মধ্যে সবচাইতে অধিক মারাত্মক ও ধ্বংসকর বিষফল হইতেছে এই যে, তাহারা ধর্মহীন কুশিক্ষার ধারা চালু করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। ফলে যে মুসলমানগণ একদিন ধর্মের জন্য আখেরাতের সওয়াবের জন্য জীবনের অনেক কাজ করিতে অভ্যস্ত ছিল, সেই সওয়াবের কাজ করা এখন ভুলিয়া গিয়াছে। এখন তাহারা সর্বকাজেই দুনিয়ার হীন স্বার্থকেই খুব বড় করিয়া দেখে। তাহারা এখন বিদ্যা শিখে চাকুরীর জন্য বা পয়সা উপার্জনের জন্য। ডাক্তার গরীব রোগীকে ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া দেয়, উকীল গরীব ময়লুমকে পরামর্শ দেয়, শিক্ষক ছাত্রকে পড়ায়—এসব তাহারা শুধু টাকার জন্যই করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু মুসলমানদের এমন দিন ছিল, যেদিন মুসলমানেরা এইসব শুধু গরীবের উপকারের জন্য তথা আখেরাতের সওয়াবের জন্য করিতে অভ্যস্ত ছিল।

শুনিয়াছি, লণ্ডনের মহাসভা ব্যক্তির ছাত্রদিগকে বাড়ীতে জায়গীর রাখিয়া তাহাদের নিকট হইতে টাকা লয়, ব্যবসা করে এবং তাহাদের বলা হয় Paid guest বা টাকার অতিথি। সৌভাগ্য-বশতঃ আমাদের দেশে এখনও মেহমানদের কাছ থেকে বা জায়গীর ছাত্রদের কাছ থেকে, টাকা লওয়ার প্রথা চালু হয় নাই। অবশ্য যাহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য বর্বরতা বনাম সভ্যতা বেশী ঢুকিয়াছে তাহারা দ্বীনি-এলমের সাহায্যার্থে মাদ্রাসার ছাত্র জায়গীর রাখা ছাড়িয়া দিয়াছে। এই প্রথা ইসলামের আদি হইতেই চলিয়া আসিতেছে—যে, কতক লোক আল্লাহর দ্বীনের উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্য বাড়ী-ঘর ত্যাগ করিয়া বিদেশে বাহির হইয়াছে এবং সেখানে মুসলমানগণ রাসূলের এই মেহমানদিগকে আখেরাতের সওয়াবের উদ্দেশ্যে থাকিবার ও খাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আজও যেসব মুসলমান খৃষ্টান সভ্যতার (!) দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই, তাহারা তালেবে এলম ছাড়া ভাত খাওয়াকে আল্লাহর রহমত উঠিয়া যাওয়া মনে করে। কোরআন হাদীসের এলম তথা এলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী তালেবে এলমদিগকে রাসূলের খাছ মেহমান মনে করিয়া শুধু সওয়াবের নিয়তেই বাড়ীতে স্থান দেওয়া, দুনিয়ার কোন স্বার্থে নহে; বরং শুধু আখেরাতের সওয়াবের উদ্দেশ্যেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াকে বলা হয় জায়গীর। ইহা একটি সুন্দর ব্যবস্থা, কারণ তালেবে এলমদের থাকা-খাওয়ার মোট তিন প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে। যথা— (১) বাড়ীতে থাকিয়া খাওয়া ও পড়া, (২) বোর্ডিংয়ে থাকিয়া খাওয়া-পড়া ও (৩) জায়গীরে থাকিয়া খাইয়া পড়া। এই তিন প্রকার ব্যবস্থার মধ্যে—সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছে জায়গীর ব্যবস্থা। কেননা, বাড়ীতে থাকিয়া পড়িতে গেলে পড়ার মধ্যে অনেক বাধাবিঘ্ন দেখা দেয়। আর বোর্ডিংয়ে থাকিতে গেলে খরচ অনেক বেশী, যাহা অনেকের পক্ষে অনেক সময় বহন করাই সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে জায়গীর থাকিলে একদিকে (১) জায়গীরওয়ালার বাড়ী দ্বীনি-এলমের চর্চায় আলোকিত হয়। (২) জায়গীরওয়ালা দ্বীনের খেদমত করিয়া ছদকায়ে জারিয়ার সওয়াব হাছিল করে; অথচ যে পরিবারে ৪/৫ জন লোক আছে সেই পরিবারে একজন তালেবে এলমের খোরাকের জন্য



পৃথক কোন ব্যয় করিতে হয় না। (৩) গরীবদের ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা শুধু এই জায়গীরের ব্যবস্থাদ্বারাই সম্ভবপর। (৪) যে তালাবে এলুম জায়গীরে থাকে, তাহার এলুম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সেবারও অভিজ্ঞতা জন্মে এবং অনেক নৈতিক চরিত্র সে আয়ত্ত করিতে পারে।

অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের বাড়ীতেই অবশ্য অবশ্য একজন তালাবে এলুম রাখা একান্ত দরকার এবং নিয়ত খালেছ করিয়া একমাত্র আখেরাতের সওয়াবের নিয়তেই রাখা আবশ্যিক। আজকাল ইসলামী শিক্ষা বাদ দিয়া, ইসলামী শিক্ষা লাভের ফরয তরক করিয়া যাহারা ধর্মহীন শিক্ষা লাভ করে, তাহারাও অনেকে জায়গীর খোঁজে। কিন্তু মুসলমানদের জানিয়া রাখা দরকার যে, জায়গীর রাখার আসল উদ্দেশ্য হইতেছে সওয়াব হাছিল করা। আর সওয়াব হাছিল হইবে ধর্মবিদ্যা শিক্ষার্থী তালাবে এলুমদের সাহায্য করিলে। কিন্তু যাহারা ধর্মহীন শিক্ষা লাভ করে তাহারা টাকার জন্যই পড়ে। এই টাকার লালসা তাহাদের এত স্পষ্ট যে, ওকালতি ডাক্তারী প্রভৃতি করিবার সময় তাহারা টাকা ছাড়া কাজ করে না এবং তাহারা বলেও যে, আমরা টাকার জন্যই পড়িয়াছি এবং টাকা খরচ করিয়াই পড়িয়াছি, অতএব, আমরা টাকা ছাড়া কাজ করিতে পারিব না। এই ধরনের শিক্ষার্থীদিগকে সাহায্য করিয়া আখেরাতের সওয়াব পাওয়ার আশা করা একেবারেই বৃথা।

আজকাল ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত শিক্ষার প্রভাবে এবং তৎসঙ্গে খৃষ্টানী বর্বরতামূলক, তথাকথিত সভ্যতার তাসীরে অনেক নব্যশিক্ষিত যুবক ইসলাম ধর্মের সত্য সনাতনতা অস্বীকারপূর্বক উহা ত্যাগ করিয়া বসিতেছে এবং ইসলাম বিরোধী নাচ, গান, বাদ্য, বাজনা, থিয়েটার, সিনেমা, বেহায়ানা, বেপর্দা পভৃতি চরিত্রহীনতামূলক অনেক কাজ করিতেছে। এ সমস্ত ইসলাম বিরোধী কাজ হইতে মুসলমানদের নিজেদেরও বাঁচিয়া থাকা কর্তব্য এবং নিজেদের ছেলেমেয়েদিগকেও বাঁচাইয়া রাখা দরকার। শুধু তাহা নহে, নিজ নিজ সমাজকেও এ সময় চরিত্রনাশক কার্য হইতে পবিত্র রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা একান্ত আবশ্যিক। মুসলমানদের দুনিয়াবী উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সব সময় খেয়াল রাখা দরকার, যেন তাহাদের ধর্ম নষ্ট না হয় এবং আখেরাতের মঙ্গলজনক কার্য নষ্ট না হয়।

### সমাজ বন্ধন

লোকে সাধারণতঃ ভাল বা মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকে তিন কারণে—(১) খোদার ভয়ে, (২) সমাজের চাপে, (৩) আইনের ভয়ে।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার ছাহাবায় কেলাম (রাঃ) এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা দুনিয়াতে চালু করিয়াছেন, যাহাতে পরস্পর সমবেদনা, সহানুভূতি ও হামদর্দি বিদ্যমান ছিল। একজনকে মন্দ কাজ করিতে দেখিলে সকলে তাহাকে নিষেধ এবং বারণ করিত। ভাল কাজ হইতে পশ্চাৎপদ হইতে দেখিলে সকলেই তাহাকে উক্ত ভাল কাজ করিবার জন্য আদেশ ও উৎসাহ প্রদান করিত। কেহ বিপদে পতিত হইলে সকলেই তাহার প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহাকে সাহায্য প্রদান করিত ও তাহার বিপদ মোচনে সাহায্য করিত। কেহ সম্পদশালী হইলে সকলেই তাহাতে খুশী হইত; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বৃটিশ শাসনের বিষফলস্বরূপ এখন আর আমাদের সমাজে সেই সুন্দর সমাজ বন্ধন নাই। ইসলাম ধর্মের প্রধান একটি ফরয এবং বড় একটি শিক্ষা হইতেছে ‘আম্র বিল-মারুফ’ ও ‘নেহী আ’নিল মুন্কার’

অর্থাৎ, সংকাজের আদেশ ও উৎসাহ প্রদান এবং মন্দকার্য হইতে নিবৃত্তকরণ। অথচ ইংরেজদের স্বভাব হইতেছে ‘Oil your own machine’ “নিজের চরকায় তেল দাও”।

## সীরাতে পাক

আল্লাহ তা'আলা শেষ যুগে মানুষের হেদায়তের জন্য শুধু একখানি কিতাব ‘আল-কোরআনুল করীম’ পাঠাইয়া ক্ষান্ত হন নাই; বরং সঙ্গে সঙ্গে একজন অনুপম পূতচরিত্র মহামানবকে রাসূল বানাইয়া তাঁহার দ্বারা কোরআনের নির্দেশগুলিকে সুষ্ঠুভাবে প্রচার করার এবং উহার উদ্দেশ্যগত অর্থসমূহ পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, অন্যথায় কোরআনের ব্যাপকার্থক ভাষায় বিরূপ অর্থ করিয়া লোকে বিপথগামীও হইতে পারিত। এই কারণেই নিষ্পাপ ও পূতচরিত্র রাসূলের দ্বারা কোরআনের নির্ভুল অর্থ করাইয়া নিখুঁত আদর্শ কায়ম করিয়াছেন।

অতএব, রাসূল (দঃ)-এর জীবন চরিত্রকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করা, শ্রবণ করা, আলোচনা করা এবং গবেষণা করা প্রত্যেকটি মানুষেরই একান্ত কর্তব্য। আল্লাহকে ভালবাসিতে এবং তাঁহার ভালবাসা লাভ করিতে সকলেই চায়। আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার একমাত্র উপায় তাঁহার রাসূলকে ভালবাসা এবং প্রমাণস্বরূপ রাসূলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইহধামে জীবন যাপন করা। এই কথা কোরআন শরীফেও আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিয়াছেনঃ

○ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

“হে রাসূল! আপনি মানুষকে বলিয়া দিন—‘যদি তোমরা আল্লাহর ভালবাসা কামনা কর, তবে আমাকে ভালবাসিয়া আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চল, ইহাতেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।”

এসম্বন্ধে হাদীস শরীফেও আছেঃ

○ لَأَيُّمِنُ أَحَدَكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

“হে মানবজাতি! তোমরা কেহই ঈমানদার বলিয়া গণ্য হইবে না, যাবৎ না তোমরা নিজেদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পুত্র, রাজা-বাদশাহ্, আমীর-ওমারা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী প্রভৃতি সমস্ত মানবজাতি অপেক্ষা আমার প্রতি অধিক ভালবাসা দেখাইতে না পারিবে।” কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিত, কার্যাবলী, গুণাবলী, ঈমানের দৃঢ়তা, এবাদত বন্দেগীতে খোদা-প্রেমের অনুপম ভাবাবেগ, লেন-দেন ও কাজ-কারবারের মধ্যে অতুলনীয় আমানতদারী, ওয়াদা প্রতিপালন, আচার-ব্যবহারে ভিতর এবং বাহির উভয় দিকেই নির্মলতা, স্বভাবের নম্রতা, ভদ্রতা ও উদারতা, প্রাণঘাতী শত্রুর বেলায়ও ইনছাফ এবং ন্যায়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন সম্বন্ধে শুধু তাঁহার কথার উপদেশগুলিই নয়; বরং তাঁহার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তিনি যে সমস্ত কার্যকরী আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, যে পর্যন্ত তৎসম্বন্ধে ভালভাবে জ্ঞানলাভ করা না যাইবে—সে পর্যন্ত তাঁহার প্রতি ভালবাসা এবং তাহার প্রকৃত অনুসরণ সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং রাসূল (দঃ)-এর জীবনী আলোচনা করা একান্ত দরবার। রাসূলের জীবনী আলোচনার

মজলিসকে কেহ “সীরাতে পাকের মজলিস” বলে, কেহ মৌলুদ শরীফ বয়ানের মাহ্ফিল বলে, কেহ বা মাহ্ফিলে মিলাদ বলে, আসল উদ্দেশ্য একই—ভাষা ভিন্ন ভিন্ন। ইহা অত্যন্ত জরুরী।

মুসলমানদের ঘরে ঘরে এবং দোকানে দোকানে শুধু বৎসরে এক আধবার নয়, শুধু রবিউল আউয়ালের চাঁদে নয়, মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে এই পবিত্র মাহ্ফিলে মিলাদের অনুষ্ঠান হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, সমাজের অজ্ঞতা এবং মুর্থতা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। মাহ্ফিলে মিলাদ সম্বন্ধে বড় বাড়াবাড়ি এবং ঝগড়া বিতর্ক হইতেছে। ঝগড়া ফাসাদের বিতর্কের বাড়াবাড়ি ত্যাগপূর্বক, এই পবিত্র মাহ্ফিলের অনুষ্ঠান সর্বত্র হওয়া দরকার। সংক্ষেপের চেয়েও সংক্ষেপেও এই মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত হইতে পারে। হয়ত হুযূরের কর্মময় জীবন ধারা সম্পর্কীয় একখানা হাদীস পড়িয়া বুঝাইয়া দিয়া এবং দুরুদ ও সালাম পাঠ করিয়া মাহ্ফিল শেষ করা যাইতে পারে। সমগ্র হাদীস গ্রন্থগুলিই রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর জীবন চরিত, সে অনেক লম্বা। যেখানে সদাসর্বদা হাদীস পাঠ ও শ্রবণ অনুষ্ঠিত হইতেছে সদা-সর্বদা হুযূরের প্রতি দুরুদ ও সালাম পাঠ করা হইতেছে, সেখানে খাছ মিলাদের মাহ্ফিল অনুষ্ঠানের কোন দরকার নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, যেখানে কোরআনের ও আল্লাহ্-রাসূলের আলোচনা হওয়ার সুযোগ মোটেই হয় না, সেখানে খাছ সীরাতে পাকের মজলিস বা মাহ্ফিলে মিলাদ নাম দিয়া অনুষ্ঠান করিলে তাহা বেদ’আত হইবে—কখনও নহে। আবার কেহ কেহ অজ্ঞতাবশতঃ মনে করেন, আগর বাতি জ্বলাইয়া সাজসজ্জা ও আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠান করিয়া খাড়া হইয়া দুরুদ ও সালাম না পড়িলে সেটা মৌলুদ শরীফের বয়ান হইল না—এটাও ভুল ধারণা।

প্রিয় মুসলিম ভাইগণ! আমার উপর খারাব ধারণা করিবেন না। আমি বেদ’আতিও নই, ওয়াহাবীও নই। আমি একজন গুনাহ্গার, আপনাদের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী নগণ্য খাদেম—মুসলমান। আমি নিতান্ত ব্যথা ভরা অন্তর নিয়া আপনাদের খেদমতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি—আপনারা এই “ওয়াহাবী বেদ’আতির” ঝগড়া ও মারামারি ছাড়ুন। খবরদার! খবরদার!! উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করিবেন না। সকলেই আমরা মুসলমান। সকলেই নিজ নিজ দোষ-ত্রুটি সংশোধন কাজে ব্যাপৃত থাকুন এবং সকলে একতাবদ্ধ হইয়া ইসলামের খেদমতের কাজে এবং ইসলামের দুশমনদের প্রতিরোধ কার্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে মনোনিবেশ করুন। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী, ছাহাবায়ে কেরামের জীবনী, পূর্ব যুগের আশিয়া কেরামের, আউলিয়াগণের জীবনী অতি মাত্রায় আলোচনা করুন। তাহাই হইবে প্রকৃত মিলাদ মাহ্ফিল। কিন্তু অনেকে মিলাদ মাহ্ফিলে বিনা তহ্কীকে বাজে ও মিথ্যা ‘মাউযু’ রেওয়ায়ত পাঠ বা আলোচনা করিয়া বাক চাতুর্য দেখাইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট হইতে বাহ্বা আদায় করিয়া থাকে। মনে রাখিবেন, শয়তান চির-সজাগ, ইসলামের শত্রু দুনিয়াতে আবহমানকাল হইতে আছে ও থাকিবে। খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন, আপনাদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণপূর্বক শয়তান শত্রুদল ঈমানের সর্বনাশ না ঘটায়। মাউযু রেওয়ায়তগুলি শয়তানের প্ররোচনায় ইসলামের শত্রুদের কর্তৃক রচিত—হাদীসের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আসল দামী জিনিসের নকল খুব বেশী হইয়া থাকে। কাজেই শত্রু হইতে এবং নকল জিনিস হইতে সদা সতর্ক থাকা দরকার।

## মাদ্রাসার জন্য চাঁদা গ্রহণ

মাদ্রাসা এমন একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান—যেখানে কোরআন-হাদীস শিক্ষা দেওয়া হয়। ইসলাম ধর্মের ভিত্তি যেহেতু অন্যান্য ধর্মের মত শুধু পুরাতন প্রথার উপর নয়, বরং আল্লাহর প্রেরিত সত্য জ্ঞানের ভাণ্ডার কোরআন-হাদীসের উপর এবং এই কোরআন ধারাবাহিক শিক্ষা ব্যতিরেকে জীবিত থাকিতে পারে না; কাজেই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান কয়েম রাখা সমস্ত মুসলমানের উপর ফরয। একটি ফরয কাজে দায়িত্ব পালন ছাড়াও একটি নফল কাজ অপেক্ষা ৭০ গুণ বেশী সওয়াব পাওয়া যায়। সুতরাং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানের জন্য চাঁদা দিয়া সাহায্য করা সমস্ত মুসলমানের উপর একান্ত কর্তব্য।

যাবৎ ইসলামী হুকুমত কয়েম ছিল, হুকুমতের 'বায়তুল মাল' হইতে মাদ্রাসার যাবতীয় খরচ বহন করা হইয়াছে। শুধু ঘর দরজা ও আসবাব-পত্রের খরচ নয়, শুধু মুদাররেসগণের খরচ নয়, শুধু কিতাব-পত্রের খরচ নয়, তাহলেবে এলেমদের যাবতীয় ব্যয়ভার বায়তুল মাল হইতেই বহন করা হইয়াছে। তারপর যখন খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের ধূর্তামির সামনে এবং তাহাদের স্নায়ুযুদ্ধের সামনে মুসলমানগণ টিকিয়া থাকিতে না পারায় মোঘল সাম্রাজ্যের পতন হইল, তখনও মুসলমানগণ ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ওয়াক্ফ, যাকাত, ছদকা খয়রাতের মাল জমা করিয়া মাদ্রাসা ফান্ড গঠনপূর্বক মাদ্রাসার যাবতীয় খরচ চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ধরনের মাদ্রাসাগুলি কওমী মাদ্রাসা নামে অভিহিত হইয়াছে। এই কওমী মাদ্রাসাগুলির বিশেষত্ব এই যে, এই ধরনের মাদ্রাসায় যাহারা শিক্ষা লাভ করিবে তাহাদের (১) চাকুরীর মনোবৃত্তি গঠিত হইবে না। (২) সমাজ সেবার ও ধর্ম-প্রচারের মনোভাবই উৎপন্ন হইবে। তাহারা কেবলমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে নেকী ও সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে আজীবন কওমের ও ধর্মের সেবা ও খেদমত করিয়া যাইবে। (৩) তাহারা ইসলামের বিধানাবলী পূর্ণরূপে শিক্ষা লাভ করিবে। নিমমোল্লা বা নামে মাত্র পাগড়ীধারী আলেম হইবে না, পূর্ণ আলেম হইবে। (৪) তাহারা চরিত্রহীন হইবে না। তাহারা পাশ্চাত্য খৃষ্টানী প্রভাবে প্রভাবিত হইবে না। তাহারা ইসলামী চরিত্রে চরিত্রবান হইবে। তাহারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে এবং ইসলামী তাহীব, তমদুন্ ও সভ্যতাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

অতএব, এহেন মহান কাজের জন্য যাহারা চাঁদা দান করিবেন, তাঁহারা ছদকায়ে জারিয়া কয়েম করিয়া অফুরন্ত পুণ্যের অধিকারী হইবেন। আর যাহারা এ সমস্ত কওমী মাদ্রাসাগুলির জন্য খালেছ দ্বীনী-এলমের উন্নতির নিয়তে চাঁদা আদায়ের কাজ করিবেন, তাঁহারা চাঁদা দাতাগণের সমপরিমাণ ছদকায়ে জারিয়া কয়েম করত মহাপুণ্যের কাজ করিবেন। ইসলামের ও দ্বীনী-এলমের শত্রুরা এহেন মহৎ কাজকেও যিল্লতির কাজ, আরবী শিক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি শিক্ষা, আরবী মাদ্রাসার জন্য চাঁদা আদায় করা ভিক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই নহে ইত্যাদি নানারূপ প্রোপাগাণ্ডার দ্বারা সমাজের সরলপ্রাণ মুসলমানদের ভিতর বিরূপ আছর ঢুকাইয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ নিজের জন্য ভিক্ষা করা অবশ্যই যিল্লতির কাজ। কিন্তু কওমের জন্য এবং ধর্মের জন্য চাঁদা আদায় করা

যিল্লতির কাজ নহে। অবশ্য চাঁদা আদায়কারীর নিয়ত, আমল-আখলাক এবং কার্যপদ্ধতি নির্মল ও খাঁটি থাকা আবশ্যিক।

### দানের ফযীলত

১। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন : বাসুলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : দান কর, হে মানব সন্তান! আমিও তোমাকে দান করিব। —বোখারী ও মোছলেম

২। হযরত আয়েশার ভগ্নী হযরত আছমা (রাঃ) বলেন : রাসুলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকে বলিয়াছেন : দান করিবে, মালের হিসাব-নিকাশ করিবে না, তাহা হইলে আল্লাহ্ও তোমাকে দিতে হিসাব-নিকাশ করিবেন না। ধরিয়া রাখিবে না, তাহা হইলে আল্লাহ্ও তোমার ব্যাপারে ধরিয়া রাখিবেন না। নিজের শক্তি অনুযায়ী দান করিবে। সামান্যই হউক না কেন।

—বোখারী, মোছলেম

৩। হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, যুলম-অত্যাচার হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কেননা, উহা কিয়ামতের দিন অন্ধকারস্বরূপ হইয়া তোমাকে গ্রাস করিবে। আর কৃপণতা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কেননা, তোমাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহাদিগকে কৃপণতা ধ্বংস করিয়াছে। উহা তাহাদিগকে পরম্পরের রক্ত বহাইতে এবং হারামকে হালাল করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। —মোছলেম

৪। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন : এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ্ (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল : হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ দানে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়? হযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন : যখন তুমি সুস্থ থাক, মালকে ভালবাস, দারিদ্র্যকে ভয় কর এবং তওয়াংগরীর আশা রাখ, তখনকার দানে অধিক সওয়াব পাওয়া যায়; দানে বিলম্ব করিও না তাবৎ, যাবৎ তোমার প্রাণ হলকুমে পৌঁছে, আর তুমি বলিতে থাক : অমুককে এটা দিবে, অমুককে ওটা দিবে। অথচ এই মাল তখন অন্যের হইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইবার পূর্বেই দান করিবে, যখন তুমি মালের প্রতি মোহতাজ থাকিবে। ইহাতে অধিক সওয়াব রহিয়াছে।

—বোখারী ও মোছলেম

৫। হযরত আবুযর গেফারী (রাঃ) বলেন, একবার আমি রাসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলাম, তখন তিনি খানায়ে কা'বার ছায়ার বসা ছিলেন। তখন আমাকে দেখিয়া বলিলেন : তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত—আমি রবেব কা'বার কছম করিয়া বলিতেছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : হযূর আমার বাপ-মা আপনার জন্য কোরবান যাক : তাহার কাহারা? হযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন : যাহাদের মাল বেশী আছে তাহার। অবশ্য যে ব্যক্তি আগে-পিছে ও ডানে-বামে দান করিবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত নহে। কিন্তু এইরূপ লোক কমই।

—বোখারী ও মোছলেম

৬। হযরত আবু হুরাইরা রাখিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন : দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্রও নিকটে, বেহেশ্তেরও নিকটে এবং মানুষেরও নিকটে; আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্ হইতেও দূরে, বেহেশ্ত হইতেও দূরে, মানুষ হইতেও দূরে, অথচ দোযখের নিকটে। একজন মূর্খ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট একজন এবাদতকারী কৃপণ দরবেশ হইতে নিশ্চয়ই অধিক প্রিয়। —তিরমিযী

৭। হযরত আবুদুদারদা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি মউতের বিছানায় শুইয়া দান করে বা গোলাম আযাদ করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের পেট ভরিয়া খাওয়ার পর অতিরিক্ত খাদ্য অন্যকে দান করে। —নাছায়ী, দারেমী ও তিরমিযী

৮। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তি হালাল রুখী হইতে একটি খেজুর পরিমাণ মালও দান করে, আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে নিজের ডান হাতে কবুল করেন এবং উহাকে তাহার জন্য বাড়াইতে থাকেন, যেভাবে কোন ব্যক্তি আপন ঘোড়ার বাচ্চাকে পরওয়াশ করিয়া বাড়াইতে থাকে। এমনকি তাহার সেই সামান্য দান পাহাড় পরিমাণ হইয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা হালাল ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করেন না। —বোখারী ও মোছলেম

৯। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ দান কাহারো মালকে কমায় না। ক্ষমা দ্বারা আল্লাহ্ কাহারো সম্মানকে বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস করেন না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নিজকে ছোট মনে করে, আল্লাহ্ তাহাকে বড় করেন। —মোছলেম

১০। হযরত ফাতেমা বিস্তে কাইস (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন, যাকাত ব্যতীতও মালে মানুষের হক রহিয়াছে। —তিরমিযী

### ওস্তাদ-ভক্তি ও ওস্তাদের খেদমত

ওস্তাদকে ভক্তি করা, ওস্তাদের সন্নিধানে থাকিয়া সর্বদা তাঁহার খেদমত করা, পিতা-মাতা প্রভৃতি মুরুব্বীয়ানকে ভক্তি করা, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা, বয়ঃকনিষ্ঠ ও নিজের ছেলেমেয়েদিগকে স্নেহের চোখে দেখা এবং নম্র ব্যবহার করা ইসলামের আদর্শ। ইসলামী আদর্শ ছিল—ওস্তাদগণ শাগরিদগণ হইতে কোন বেতন বা পারিশ্রমিক না নিয়া, শুধু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সওয়াব লাভের নিয়তে এবং দ্বীনের ও কওমের খেদমতের উদ্দেশ্যেই শিক্ষা প্রদান করিতেন। আর শাগরিদগণও ওস্তাদগণকে প্রাণের সহিত ভক্তি করিত। আজীবন নিজদিগকে ওস্তাদের কাছে ঋণী মনে করিত। যে কোন সুযোগে কায়িক বা আর্থিকভাবে ওস্তাদের কিছু খেদমত করিতে পারিলে নিজেকে মহাসৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিত, ওস্তাদের খেদমতে কায়িক পরিশ্রম করাকে কোনরূপ হীনতা বা যিল্লতী মনে না করিয়া পরম গৌরবের কাজ মনে করিত। আর্থিক খেদমত করাকে ভিক্ষা বা হীনতার কাজ বলিয়া মনে স্থান দিত না, বরং শাগরিদগণ ইহাতে মনে করিত, যাহার কাছ হইতে আল্লাহ্ ও রাসূলের পরিচয় লাভ করিয়াছি, তাঁহাকে কিছু অর্থ প্রদান করা বাস্তবিকপক্ষে অর্থের সর্বাপেক্ষা অধিক সদ্যবহার। ইহা শুধু প্রাচ্যদেশের পৌরাণিক প্রথা নহে, ইহাই হইতেছে ইসলামের চিরন্তন আদর্শ।

সহপাঠীদের সহিতও বয়স এবং মর্যাদানুসারে সদ্যবহার এবং সহানুভূতি প্রকাশ করা ইসলামের আদর্শ। সহপাঠীদের সহিত খাঁটি ভাতৃত্বভাব বজায় রাখাই ইসলামের নীতি। কিন্তু আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষা ও নীতির প্রভাবে সেই পবিত্র নিঃস্বার্থ সম্পর্ক লোপ পাইয়াছে। ওস্তাদগণও বিনা বেতনে পড়ান না, ছাত্রগণ শিক্ষককে বেতনভোগী কর্মচারী বলিয়া মনে করে। সহপাঠীদের ভাতৃত্বভাব, সদ্যবহার, সহানুভূতির পরিবর্তে হিংসা-বিদ্বেষ, রেষাঘোষি ভাব উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। সেই ওস্তাদ ভক্তিও এখন আর নাই। ওস্তাদের খেদমত করাকে হীনতা ও যিল্লতির কাজ বলিয়া মনে করা হয়। ইহা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব। ইহাকে বর্জন না করিলে ওস্তাদ শাগরিদের সেই চির মধুর সম্পর্ক আর ফিরিয়া আসিবে না।

## ওস্তাদকে হাদিয়া ও বিনিময় প্রদান

বর্তমান যুগে টাকার কর্মচারীদের মধ্যে কিছুটা সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা এবং কর্তব্য জ্ঞান দেখা যায়। কিন্তু যঁাহারা আল্লাহর ওয়াস্তের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন—তঁাহাদের মধ্যে সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, কর্তব্যপারায়ণতা শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহা ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী। ইসলামী আদর্শ এই যে, দুনিয়ার চেয়ে যেমন আখেরাত বড়, দুনিয়ার টাকার চেয়ে তেমনই আখেরাতের সওয়াব অনেক বড়। সবচেয়ে বড় হইল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, আল্লাহর ওয়াস্তে কাজ কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই বটে। কোটি কোটি টাকার চেয়ে বিন্দুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির মূল্য অনেক বেশী। টাকার কর্মচারীরা পার্থিব তুচ্ছ টাকা-পয়সা লাভের জন্য নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্যপারায়ণতার সহিত কাজ করিয়া থাকে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিরূপ অমূল্য ও অনুপম রত্ন লাভের জন্য আল্লাহর ওয়াস্তের কাজে তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক নিয়মানুবর্তী ও কর্তব্যপারায়ণ হওয়া উচিত নহে কি ?

উজরত বা বেতন লইয়া শিক্ষা প্রদান করা এবং আল্লাহর ওয়াস্তে তঁাহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান সহকারে শিক্ষা প্রদান করার মধ্যে আসমান জমিনের পার্থক্য। বেতন লইয়া শিক্ষা প্রদানের কাজ স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাজ এবং উজরত না লইয়া দ্বীনি-এলমের খেদমতের নিয়তে শিক্ষা প্রদান নিঃস্বার্থ ত্যাগের একটি উজ্জ্বল আদর্শ।

কিন্তু একজন ওস্তাদ দায়িত্ব ও নিয়মানুবর্তিতা সহকারে বিনা বেতনে কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে একজনের ছেলেকে এলম ও আদব শিক্ষা দিলেন, আর যদি ছেলের পিতাও ওস্তাদকে হাদিয়া-স্বরূপ বেতনের চেয়েও বেশী টাকা দিলেন কিংবা একজন গ্রন্থকার আল্লাহর ওয়াস্তে একখানা ধর্ম-পুস্তক লিখিয়া কওমের খেদমতের জন্য স্বত্বত্যাগপূর্বক একজন পাল্লিশারকে দিলেন। পাল্লিশার দ্বীনি খেদমতের নিয়তে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া কিছু লাভবানও হইলেন। অতঃপর দ্বীনি খেদমতের নিয়তেই গ্রন্থকারকে হাদিয়াস্বরূপ শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু টাকা দিলেন। এতদুভয়াবস্থাতেই বৈজ্ঞানিক স্কুল দৃষ্টিতে এবং যুক্তির মাপকাঠিতে বিনিময় বা উজরত প্রদান ও আল্লাহর ওয়াস্তে হাদিয়াপ্রদানের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। কেননা, একজনের উদ্দেশ্য হইতেছে তুচ্ছ পার্থিব টাকা পয়সা লাভ, আর অপরজনের নিয়ত হইতেছে কওমের খেদমত, দ্বীনি-এলমের প্রচার এবং মহান আল্লাহর তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ। কিন্তু এই নিয়ত সম্পূর্ণ নির্মল ও খাঁটি হওয়া একান্ত আবশ্যিক।

এই শ্রেণীর আল্লাহর ওয়াস্তের কাজে খাঁটি নিয়তের পরিচয় তখনই পাওয়া যাইবে, যখন কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে কোন প্রকার ত্রুটি করিবে না এবং কোন অবস্থাতেই এই খেদমত পরিত্যাগ করিবে না। কিছু দিন আল্লাহর ওয়াস্তে কাজ করিয়া কাজের হক আদায়ের ত্রুটি করা বা কিছুদিন কাজ করার পর কওমের মধ্যে কদরদানী নাই বলিয়া কাজ ছাড়িয়া দিলে প্রমাণ হইয়া গেল যে, নিয়ত খাঁটি ছিল না। নিয়ত খাঁটি থাকিলে সকল অবস্থাতে

নির্ভর থাকিবে একমাত্র আল্লাহর উপর এবং আল্লাহর উপর নির্ভর থাকিলে সেকাজ কেহ ত্যাগ করিতে পারে না।

আমি একথা বলিতেছি না যে, শাগরিদ পড়াইয়া বা এলম শিক্ষা দিয়া বেতন লওয়া না-জায়েয বা ধর্মগ্রন্থ লিখিয়া বইয়ের কপি বিক্রি করা না-জায়েয। জায়েয থাকা ভিন্ন কথা, আর উচ্চ মর্যাদা লাভ করা ভিন্ন কথা। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই যথাযোগ্য অকৃত্রিমতা, খালেছ নিয়ত, যথাবিহিত দায়িত্ববোধ থাকা আবশ্যিক; অন্যথায় উভয়বিধ অবস্থারই পরিণাম খারাপ হইয়া দাঁড়াইবে। বিশেষতঃ যাহারা আল্লাহর ওয়াস্তের নামে কাজ আরম্ভ করিয়া দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ত্রুটি করিবে এবং আমানতে খেয়ানত করিবে, তাহারা হইবে বেশী ‘মুজরিম’ অর্থাৎ বড় রকমের অপরাধী। কেননা, তাহারা আল্লাহর নামে ধোঁকাবাজি করিয়াছে। দুনিয়ার নামে লেন-দেনের কাজে ধোঁকাবাজি করাও পাপ। কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তের কাজে ধর্মের নামে ধোঁকাবাজি করার পাপ ইহা অপেক্ষা হাজার হাজার গুণ বড় ও বেশী।

### খাদ্য সম্বন্ধীয়

শূকর খাওয়া, শরাব খাওয়া, কচ্ছপ খাওয়া ইসলাম ধর্মের বিধান মতে গুরুতর পাপ। যেমন, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, জুয়া খেলার অর্জিত পয়সা খাওয়া, চুরি, ডাকাতি বা জোর-যুলুমপূর্বক চিনাইয়া খাওয়া বড় পাপ। হিন্দুরা কচ্ছপ খায়, খৃষ্টানরা শূকর খায়। শরাব খাওয়া তাহাদের ধর্মে বোধহয় নিষিদ্ধও নহে। কিন্তু আমাদের ইসলাম ধর্মে শূকর, শরাব, কচ্ছপ ও কুকুর শুধু হারামই নহে, অপবিত্রও বটে। অনুরূপ ভাবে সুদ, জুয়া, জোর-যুলুম, চুরি ডাকাতি ও মূর্তিপূজা অপবিত্র এবং হারাম। এসমস্ত হারাম দ্রব্য ভক্ষণে অন্তর এত কলুষিত, নাপাক ও অপবিত্র হইয়া পড়ে যে, পরে শত চেষ্টা করিয়াও উহাকে পবিত্র করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। অন্তরের পবিত্রতা রক্ষাই মুসলমানের প্রধান কর্তব্য।

### খানার মজলিস

অনেকে হিন্দুয়ানী প্রভাবে খানার মজলিসকে “ভোজসভা” বলে। কিন্তু শব্দটি ভাষার দিক হইতে শুদ্ধ বলিয়া ধরা গেলেও ইসলামী রুচি বিরুদ্ধ। দস্তুরখান বিছাইয়া বিছানায় বসিয়া একত্রে খাওয়াই ইসলামী আদর্শ। খাইবার সময় খোশ আলাপ করা ইসলামী আদর্শ বিরোধী নহে। অবশ্য ঘৃণ্য বিষয়ে আলোচনা কিম্বা গুরুত্বপূর্ণ ও গবেষণামূলক বিষয়ের আলোচনা করা খানার মজলিসের আদবের খেলাফ। খাইবার সময় কোন খাদ্যবস্তু হাত হইতে ছুটিয়া বা নড়াচড়ার দরুন বরতন হইতে দস্তুরখানে পড়িয়া গেলে উহাকে তুলিয়া পরিষ্কার করিয়া খাওয়া এবং খাওয়ার শেষে বরতন পরিষ্কার করিয়া হাত চাটিয়া খাওয়া ইসলামী আদর্শ। খাদ্যদ্রব্যেরও একটা মর্যাদা আছে। আল্লাহর দানের যে অমর্যাদা করে, সে অহঙ্কারী এবং অর্থ-গর্বে গর্বিত। অহঙ্কারী ও গর্বকারী আল্লাহর প্রধান শত্রু। দুঃখের বিষয়, আজকাল বরতনে কিছু খাদ্য এবং চায়ের পেয়ালায় কিছু চা অবশিষ্ট রাখিয়া দেওয়াকে ভদ্রতা বলিয়া গণ্য করা হয়। মুসলমান, সাবধান! সাবধান! আল্লাহর নেয়ামতের অপচয় করিও না।



## ডাইন হাত

ডাইন হাত দিয়া খাওয়া, কেহ কোন জিনিস দিলে ডাইন হাতে লওয়া, আবার কাহাকেও কিছু দিতে হইলে ডাইন হাতে দেওয়া, যে কাজের দুইটি দিক আছে, সে কাজ শুরু করিতে ডাইন দিক হইতে শুরু করা—যেমন জুতা, খড়ম ও পায়জামা পরিতে আগে ডাইন পায়ে পরা, সাইকেল, মোটর বা যে কোন প্রকার যানবাহনে উঠিতে আগে ডাইন পা উঠান ইত্যাদি ইসলামের বিধান ও আদর্শ। ইহার বিপরীত অর্থাৎ আগে বামদিক হইতে শুরু করা বিজাতীয় আদর্শ। যাহারা বিজাতীয় আদর্শের অনুকরণ করে, স্বধর্মের প্রতি আস্থা দুর্বল হওয়ার কারণেই তাহারা ইহা করে। তাহারা এজন্য আখেরাতের শাস্তি ত ভোগ করিবেই, অধিকন্তু ইহালোকেও তাহারা ইহা দ্বারা নিজেদের নীচমন্যতা এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের পরিচয় দিয়া থাকে। এরূপ ধর্মাভাবে দুর্বলতা ও হীনতা পরিত্যাগ করা একান্ত আবশ্যিক।

## দাঁড়াইয়া পেশাব করা

দাঁড়াইয়া পেশাব করার প্রথা প্রাক-ইসলামিক যুগে আরব দেশে প্রচলিত ছিল। এখনকার তথাকথিত প্রগতির ধ্বজাবাহী অর্বাচীন যুবকগণ সেই বর্বর যুগের প্রথাকেই প্রগতি মনে করিয়া পরের অনুকরণে নিজেদের গৌরবোজ্জ্বল আদর্শকে তাগ পূর্বক দাঁড়াইয়া পেশাব করা আরম্ভ করিয়াছে। এই অন্ধ অনুকরণ ঘোর অন্যায় এবং ভীষণ পাপ। আমাদের ইসলামের সনাতন আদর্শ এই যে, বসিয়া পেশাব করিতে হইবে। কাঁবা শরীফের দিকে মুখ বা পিঠ করিয়া বসিতে পারিবে না। পেশাবের পর মাটির ঢেলা কুলুখ এবং পানি দ্বারা পবিত্রতা হাছিল করিতে হইবে। যাহার শরীর ও কাপড় পবিত্র নয় তাহার মনও পবিত্র নয়।

## বিভিন্ন প্রকারের জুয়া

খৃষ্টানী প্রভাবে আমাদের দেশে নানা প্রকারের জুয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শব্দগঠন প্রতিযোগিতা, ঘোড়দৌড়, লটারী, ফটকাবাজারী, জীবন-বীমা ইত্যাদি ইসলাম ধর্মীয় আদর্শের বিরোধী। বিভিন্ন রকমের জুয়া খৃষ্টান ধর্মীয় অর্থলোভীগণ আমাদের দেশে ছড়াইয়া দিয়া আমাদের অর্বাচীন যুবকদের দ্বারা হারাম কাজ করাইয়া তাহাদিগকে ধর্ম হইতে দূরে সরাইয়া লইতেছে এবং দুনিয়া ও আখেরাত দোনো জাহানে তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। এ সমস্ত জুয়াড়ী দল ক্রমশঃ শ্রম-বিমুখ হইয়া অকর্মণ্য হইয়া পড়িতেছে ওদিকে আখেরাতের ব্যাপারে ধর্ম বিমুখতা তথা ধর্মদ্রোহিতা ইহাদের মধ্যে প্রসার লাভ করিতেছে; সুতরাং দুই জাহানের পক্ষেই জুয়ার পরিণাম অতীব ভয়াবহ। অতএব, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের এই সর্বনাশা জুয়ার প্রচলন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যিক।

## জাতীয়তা

আমাদের ইসলামী আদর্শ অনুসারে জাতীয়তার ভিত্তি খোদা প্রেরিত ধর্মের উপর। ধর্ম বলিতে শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস বা শুধু এবাদত বন্দেগী বুঝায় না। ধর্ম কথাটি শুধু এতদুভয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; বরং ধর্মবিশ্বাস ও এবাদত বন্দেগী হইতে আরম্ভ করিয়া ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, ইসলামী সমর ব্যবস্থা, এমনকি আন্তর্জাতিক আইন ব্যবস্থা পর্যন্ত যাহা কিছু আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল মানব জাতির ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তৎসমুদয় মিলিয়া ইসলাম ধর্ম, এবং এই ইসলাম ধর্মের পূর্ণ অনুসরণকারীগণ সমষ্টিগতভাবে মুসলিম জাতি। আঞ্চলিক রাষ্ট্রের বাউণ্ডারী, ভাষা, বর্ণ বা বংশ আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি নহে। বিশ্বব্যাপী এক মুসলিম জাতিকে ধৃত ও কুচক্রী খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের অর্বাচীন যুবকদের উপর তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়া আমাদিগকে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অতি সত্ত্বর এই পাশ্চাত্য বর্বরতার অন্ধ অনুকরণ প্রবণতার জোঁয়াল আমাদের কাঁধ হইতে দূরে নিক্ষেপ করা দরকার। অন্যথায় জাতির ভবিষ্যৎ অচিরেই আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া ভয়াবহ পরিণাম ডাকিয়া আনিবে।

## অছিয়ত

মানুষ যখন মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হয়, তখন প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যুর আশঙ্কা তাহার মনে প্রবল হইয়া থাকে। মৃত্যু এক নির্দিষ্ট সময়েই আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু সেই নির্দিষ্টকাল সম্বন্ধে মানুষের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। শৈশবেও মৃত্যু ঘটে, যৌবনকালেও মৃত্যু আসে, বৃদ্ধ বয়সে ত প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যুর সম্ভাবনা মনে করিয়া কাতর হইয়া পড়ে। ফলকথা, মানুষ যখন মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়, যখন মানুষ নিজেকে পরপারের যাত্রী বলিয়া আল্লাহ্র কাছে খাঁটি দিলে তওবা করিয়া নিজের অতীত ও বর্তমান গুনাহর মা'ফী দৃঢ়রূপে কামনা করে, তখন তাহার সমস্ত হক্কুল এবাদ এবং হক্কুল্লাহ্ পরিষ্কার করিয়া মা'ফী চাওয়া দরকার এবং পরের দেনা, অন্যের আমানত কাহারও সঙ্গে কোন ওয়াদা করিয়া থাকিলে তাহা পরিষ্কার করিয়া নির্দায় হওয়া একান্ত আবশ্যিক। যদি ছেলে মরিয়া থাকে এবং অপর ছেলে জীবিত থাকার কারণে এই মৃত ছেলের পরিত্যক্ত সম্ভানেরা দাদার সম্পত্তি লাভে মাহরুম ও বঞ্চিত হইয়া একেবারে নিঃস্ব হওয়ার বন্দোবস্ত হয় এবং এই দাদার সম্পত্তি যদি ০০০০০০ থাকে, তবে পৌত্র পৌত্রীদের জন্য ওছিয়ত করা অর্থাৎ তাহাদের জন্য সম্পত্তির এক উত্তম অংশ দান করা দাদার কর্তব্য। কোরআন শরীফে নির্দেশ আছে:

○ كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَانَ الْوَصِيَّةَ لِلْأَوْلِيَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

অর্থাৎ, হে মুসলিমগণ! তোমাদের কাহারও দ্বারে মৃত্যু উপস্থিত হইলে, যদি তাহার সম্পত্তি থাকে, তবে তখন তাহার পিতামাতা এবং নিকট-আত্মীয়দের জন্য ওছিয়ত করা তাহার উপর ফরয করা হইয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে, মীরাস বা ফরায়েযের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে এই ওছিয়তের বিধান নাযিল হইয়াছে। নির্দিষ্ট ওয়ারিসের জন্য নির্ধারিত ফরায়েযের বিধান নাযিল হওয়ার পর এই ওছিয়তের হুকুম মানসূখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে-সমস্ত নিকট-আত্মীয় ওয়ারিস শ্রেণীভুক্ত হইবে না, তাহাদের জন্য ওছিয়ত করা এখনও ফরয রহিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত মৃত্যুর নিকটবর্তী লোকটির আরও যদি কোন ধর্মীয় সৎকাজের ইচ্ছা থাকিয়া থাকে, (থাকাই বাঞ্ছনীয়) তবে সেই জন্যও ওছিয়ত করিয়া যাওয়া উচিত। যদি রোযা-নামায কাযা হইয়া থাকে, কিংবা হজ্জ, যাকাত, মানৎ, কাফফারা প্রভৃতি বাকী থাকিয়া থাকে, তবে সেগুলি আদায়ের জন্যও ওছিয়ত করিয়া যাওয়া দরকার। মসজিদ-মাদ্রাসা প্রভৃতি ধর্মীয় কওমী প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যও সম্পত্তি থাকিলে  $\frac{1}{3}$  অংশের মধ্যে ওছিয়ত করিয়া যাওয়া উচিত।

### মানুষ যখন মরিয়া যাইবে

মানুষ যখন মরিয়া যাইবে, (প্রকৃতপক্ষে মানুষ মরে না, মানুষের আত্মা অমর, শুধু কর্মফল ভোগ করার নশ্বর দেহের পরিবর্তন হয় মাত্র। সৎকর্মী-আত্মা সুফল ভোগ করিবে।) তখন তাহার বেটা-পুত্র প্রভৃতি নিকটবর্তী ওয়ারিসদের প্রতি প্রথম কর্তব্য হইবে—মৃত ব্যক্তিকে সম্মানের সহিত গোসল দেওয়া, সুগন্ধিযুক্ত কাফন পরান, সকলে মিলিয়া যথাসম্ভব তাহার হুকুকুল এবাদ তথা তাহার কৃত যাবতীয় ভুল-চুক খাতা-কছুর প্রভৃতি মাফ করাইয়া লইয়া তাহার জন্য জানাযার নামাযের মধ্যে আল্লাহর দরবারে দো'আ ও সুপারিশ করা এবং সম্মান ও তা'যীমের সহিত গভীর মাটির নীচে দাফন করিয়া রাখা। অতঃপর দ্বিতীয় কর্তব্য—তাহার কোন ঋণ থাকিলে তাহা পরিশোধ করা। তৃতীয় কর্তব্য—সম্পত্তির  $\frac{1}{3}$  অংশ হইতে মৃত ব্যক্তির কৃত ওছিয়তগুলি পূর্ণ করা। মোট সম্পত্তির  $\frac{1}{3}$  অংশের চেয়ে বেশী ওছিয়ত করিয়া থাকিলে তাহা নির্ভর করিবে ওয়ারিসগণের সম্পত্তি ও অনুমতির উপর। চতুর্থ কর্তব্য ওছিয়ত পূর্ণ করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি ওয়ারিসগণের মধ্যে ফরায়েযের কোরআনী আইন অনুসারে বন্টন করিয়া দেওয়া। মৃত ব্যক্তি ওছিয়ত না করিয়া থাকিলেও তাহার সুপুত্র সাবালেগ থাকিলে সাবালেগ ওয়ারিসগণ একত্রিত হইয়া, অথবা একাকী একজন নিজ অংশ হইতে মৃত মুরক্বির জন্য কিছু ছওয়াবরেসানী করা অতি উত্তম। মৃত্যুর পর কিছু কোরআন শরীফ পড়িয়া ফাতেহা, কুলহু-আল্লাহু প্রভৃতি মোবারক সূরা ও আয়াত পাঠ করিয়া বা তালেবে এলম ও গরীব মিসকীনদেরে খাওয়াইয়া ও দান খয়রাত করিয়া উহার সওয়াব মৃত ব্যক্তির রুহের প্রতি পৌঁছাইবার জন্য আল্লাহর তা'আলার দরবারে যে দো'আ ও প্রার্থনা করা হয়, ইহাকেই বলে—ছওয়াবরেসানী বা ফাতেহা। ফাতেহার মধ্যে কোন বেদ'আত কাজ বা কোন দুনিয়াদারীর আড়ম্বর করা বিশেষ গোনাহর কাজ। যেহেতু মৃত ব্যক্তি তাহার জমি-জমা ও অস্থাবর সম্পত্তি সবকিছু ত্যাগ করিয়া একেবারে খালি হাতে পরলোকে চলিয়া গিয়াছে। অতএব, তাহাকে কিছু সাহায্য দান করা তাহার প্রত্যেক জীবিত ওয়ারিসদের উচিত। খালেছ নিয়তে নেক কাজ না হইলে আল্লাহর দরবারে কবুল হইবে না। আল্লাহর দরবারে কবুল না হইলে, মৃত ব্যক্তি যে দেশে চলিয়া গিয়াছে, সে দেশে ছওয়াব পৌঁছাইবার শক্তি অন্য কাহারও নাই। শুধু আল্লাহু পাক কবুল করিলে তিনিই মেহেরবানী করিয়া উহার ছওয়াব মৃত ব্যক্তিকে দান করিতে পারেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে—“সাগরে নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন নিকটে একখানা ভাসমান তৃণখণ্ড পাইলেও উহার আশ্রয় অবলম্বন করিতে চায়, তদ্রূপ মৃত ব্যক্তিও কেহ সামান্য

কিছু ছওয়াব পোঁছাইলে তাহাও পাইতে চায়। হাদীস শরীফে আরও আসিয়াছে যে, মানুষ যখন মরিয়া যায়, তখন তাহার ছওয়াব লাভের এবং আখেরাতের সম্বল সংগ্রহের সমস্ত পথ বন্ধ হইয়া যায়। কেবলমাত্র তিনটি পথ খোলা থাকে : (১) যদি জীবনকালে নিজে কোন ছদকায়ে জারিয়ার কাজ করিয়া গিয়া থাকে কিংবা মৃত্যুকালে কোন ছদকায়ে জারিয়ার কাজের জন্য ওয়ারিসদিগকে ওছিয়ত করিয়া থাকে এবং ওয়ারিসগণ তাহা পালন করিয়া থাকে, তবে ইহার ছওয়াব লাভ করিয়া থাকিবে। ছদকায়ে জারিয়ার কাজ যথা—মাদ্রাসা, মসজিদ, পুল, রাস্তা, মুসাফিরখানা, ইন্দারা, পুকুর, টিউবওয়েল প্রভৃতি স্থায়ী জনহিতকর কাজে সাহায্য দান করা। (২) অথবা যদি দ্বীনী-এল্‌মের প্রতিষ্ঠান কয়েম করিয়া গিয়া থাকে। (৩) অথবা যদি কোন নেককার সন্তান রাখিয়া মরিয়া থাকে, যে সন্তান সদাসর্বদা বাপ-মায়ের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দো'আয়ে মাগ্‌ফেরাত করিতে থাকে।

প্রিয় পাঠক! একটু চিন্তা করুন। ইসলাম ধর্মের আদর্শ কত সুন্দর! কারণ, ইহা মানুষের রচিত বা প্রবর্তিত ধর্ম নহে; বরং ইহা স্বয়ং বিশ্ব-স্রষ্টা মালেকুল-মূলক আল্লাহ্ তা'আলার প্রেরিত এবং তাঁহার হাবীব ও রাসূলের প্রবর্তিত ধর্ম। এই ধর্মের মধ্যে লোকাচারের বা মানুষের মতামতের কোন স্থান নাই। মানুষ বলিয়া থাকে : “ধর্ম মানুষের জন্য, মানুষ ধর্মের জন্য নহে।” এই উক্তি সেই ধর্মের বেলায়ই খাটে, যে ধর্ম মানুষের রচিত। কেননা, মানুষের রচনার মধ্যে ভুল-প্রমাদের সম্ভাবনা আছে। কাজেই উহার মধ্যে মানুষের মতের খাতিরে পরিবর্তনও করা যাইতে পারে। কিন্তু সেটা ধর্ম নহে। উহা মানুষের মনগড়া কতিপয় স্বার্থমূলক নীতি মাত্র। ধর্ম উহাকেই বলে, যাহা স্বয়ং আল্লাহ্র তরফ হইতে আসিয়াছে। কেননা, খোদা সর্বজ্ঞ, নিরপেক্ষ ও মঙ্গলময়। তিনি মানুষের হিতাহিত বিবেচনা পূর্বেই করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার প্রেরিত ধর্মবিধান নিছক মানুষের মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে। অতঃপর কুগ্রাপি ইহাতে কোন প্রকারের পরিবর্তন-পরিবর্ধন আসিতে পারে না। কাজেই মানুষের উপরোক্ত সত্য ধর্মের বেলায় সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আমাদের দেশে কোন ধর্মে রীতি আছে যে, বাপ মরিয়া গেলে বাপের মুখে ছেলে আঙুন ধরাইয়া দিবে। তারপর আঙুনের তাপে মৃত ব্যক্তির শব মোড় খাইতে আরম্ভ করিলে লাঠি দ্বারা পিটাইয়া তাহার হাড়-গোড় ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের ইসলাম ধর্মে মৃত ব্যক্তিকে পিটাইয়া হাড় ভাঙ্গা তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্র ‘বে-তায়ীমি’ বা অসম্মান হয় এমন কোন কাজও মৃত ব্যক্তির প্রতি করা জায়েয নহে।

### ফারায়েষ

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে জীবিত ওয়ারিসদের জন্য কোরআন, হাদীস ও ফেকাহ অনুযায়ী নির্ধারিত অংশ নির্ণয় করাকে ‘ফারায়েষ’ বলে। ফারায়েষের আইন একটি অকাট্য আইন। কোরআন পাকের একটি সূরা শুধু এই আইন বর্ণনা করার জন্য খাছ করা হইয়াছে। এই সূরাটির নাম সূরাতুন-নিসা, অর্থাৎ দুর্বল, এতীম, বিধবা ও নারীদের প্রাপ্য প্রদানের আইন বর্ণনার অধ্যায়। আল্লাহ্ তা-আলা প্রথমে বলিয়াছেন : যাহারা এতীমের মাল আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহারা আঙুন উদরস্থ করিতেছে। অতি শীঘ্র তাহারা দোযখের জ্বলন্ত আঙুনে নিক্ষিপ্ত হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ফারায়েষ আইনের সাধারণ সূত্রগুলি বর্ণনা করিয়াছেন—(১) বেটা বেটিদের দ্বিগুণ অংশ পাইবে। (২) শুধু বেটি থাকিলে তাহারা একাধিক হইলে ২/৩ অংশ পাইবে। (৩) শুধু এক বেটি

হইলে সে  $\frac{1}{2}$  অংশ পাইবে। (৪) বেটা-বেটি থাকিলে মা-বাপের প্রত্যেকে  $\frac{1}{6}$  অংশ পাইবে। বেটা বা বেটি কেহই না থাকিলে মা  $\frac{1}{3}$  অংশ পাইবে। অবশিষ্ট বাপ পাইবে। কিন্তু যদি একাধিক ভাই-ভগ্নীও থাকে তদবস্থায়ও মা  $\frac{1}{6}$  অংশ পাইবে। (৫) এই সমস্ত অংশ ওছিয়তপূর্ণ করার এবং ঋণ পরিশোধের পর দেওয়া হইবে। ওছিয়তপূর্ণ না করিয়া বা দেনা পরিশোধ না করিয়া ওয়ারিসদের অংশ দেওয়া যাইবে না। (৬) মৃত স্ত্রীর বেটা বা বেটি কেহ না থাকিলে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে স্বামী  $\frac{1}{2}$  অংশ পাইবে। আর বেটা-বেটি থাকিলে স্বামী  $\frac{1}{8}$  অংশ পাইবে। (৭) নিজের ঔরসজাত কোন সন্তান রাখিয়া মরিলে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে স্ত্রী  $\frac{1}{8}$  অংশ এবং স্বামী নিঃসন্তান মরিলে স্ত্রী  $\frac{1}{8}$  অংশ পাইবে। এইসব অংশও ওছিয়ত পূর্ণ এবং ঋণ পরিশোধ করার পর দেওয়া হইবে। তাহা না করিয়া কোন অংশই দেওয়া যাইবে না। (৮) মৃত ব্যক্তির বাপ বা নিজস্ব সন্তান কেহ যদি না থাকে আর মায়ের পক্ষের বৈপিত্রয়ে ভাই-বোন থাকে, তবে তাহারা একজন হইলে  $\frac{1}{6}$  অংশ পাইবে। একাধিক হইলে  $\frac{1}{6}$  অংশ সকলে সমভাবে ভাগ করিয়া নিবে। (৯) শুধু আপন হাকীকী বোন ১ জন থাকিলে সে  $\frac{1}{2}$  অংশ পাইবে। একাধিক থাকিলে  $\frac{2}{3}$  অংশ পাইবে। কিন্তু যদি ভগ্নীদের সহিত ভাই থাকে, তবে ভাই ভগ্নীর দ্বিগুণ পাইবে। অন্য কেহ না থাকিয়া শুধু একজন বা একাধিক ভাই থাকিলে সমস্ত সম্পত্তি ভাই পাইবে। ফারায়ের আইন সম্পর্কে এই সাধারণ সূত্রগুলি বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, ওগুলি মানুষের রচিত বিধান নহে। ইহা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, যাহারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করিবে, তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা দোযখে নিক্ষেপ করিবেন এবং সেখানে তাহাদের অপমান ও লাঞ্ছনাময় ভীষণ শাস্তি হইবে। এই ধারাগুলি বর্ণনা করার পূর্বেই আবার দুইটি সাধারণ নীতি বর্ণনা করিয়াছেন। (১) পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক, নিকটবর্তী জন বর্তমান থাকিলে দূরবর্তী জন অংশ পাইবে না। যেমন বাপ থাকিলে দাদা পাইবে না, ভাই পাইবে না। দাদা থাকিলে চাচা পাইবে না, চাচা থাকিলে চাচাত ভাই পাইবে না। ভাই থাকিলে ভাতিজা পাইবে না। ছেলে থাকিলে নাতি পাইবে না। মা থাকিলে দাদী বা নানী পাইবে না। হাকীকী ভাই থাকিলে বৈমাত্রয়ে ভাই পাইবে না ইত্যাদি। এই মূল ধারাটির প্রভাব সমস্ত ধারাগুলির উপরেই বিস্তারিত হইবে। এই জন্য দ্বিতীয় ধারায় বলিতেছেন—(২) সম্পত্তি বন্টন কালে লা-ওয়ারিস আত্মীয় বা এতীমগণ বা মিস্কীনগণ উপস্থিত হইলে সমস্ত সাবালেগা ওয়ারিস একত্র হইয়া বা কোন একজন নিজ নিজ অংশ হইতে তাহাদিগকে কিছু খানা-পিনার ব্যবস্থা করিয়া দিবে এবং তাহাদের সঙ্গে মিষ্টি আলাপ করিয়া সদ্ব্যবহারের সহিত তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিবে। অবশ্য এতীম বা না-বালেগ ওয়ারিসের অংশ হইতে কিছু দেওয়া যাইবে না, সেইজন্য ওয়ার পেশ করিয়া দিবে। এই ধারাগুলি বর্ণনা করার পূর্বাচ্ছেই আল্লাহ তা'আলা তাকীদের সহিত বলিয়া দিয়াছেন যে, সাবধান! এতীমের মালের মধ্যে যেন কোনরূপে তছরূপ করা না হয়। যাহারা অক্ষম ও নিঃসহায় তাহাদের মাল তছরূফ করার পরিণাম অতীব ভয়াবহ হইবে।

এতীমের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আল্লাহ তা'আলা কোরআন শরীফে এবং রাসূলুল্লাহ হালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে বার বার তাকীদ করিয়াছেন। দাদা জীবিত থাকা অবস্থায় বাপ মরিয়া গেলে দাদাকে তাকীদ করা হইয়াছে, যেন তিনি মাহরুমোল মীরাস এতীম নাতিদের ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করেন এবং মৃত্যুকালে যেন তাহাদের জন্য ওছিয়ত করিয়া যান, যাহাতে উক্ত পিতৃহীন এতীম নাতিগণ দাদার মৃত্যুর পূর্বে ও পরে নিজেদের পিতৃবিয়োগজনিত

অভাব ও নিঃশ্বতা অনুভব করিতে না পারে। তাহাদের তা'লীম-তরবিয়ত, খাওয়া পরা ইত্যাদি কাজে যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয় এবং দাদার মৃত্যুর পরেও যেন তাহারা সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হয়। যদি দাদা সম্পত্তিহীন ও অক্ষম হয়, তবে হাদীস শরীফে আসিয়াছে—“এতীমদের পর-ওয়ারিশ করার মত কোন আত্মীয়-স্বজন না থাকিলে তাহাদের লালন-পালনের দায়িত্ব হুকুমতের।”

### হুকুমতকে সংপরামর্শ

হুকুমতের কাজ—আল্লাহর কাজে দখল দেওয়া বা লোকের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা নহে। হুকুমতের কাজ—জনগণের শ্রষ্টা বিধাতার আইনের অনুসরণে জনসাধারণের সেবা করা। মানুষের সংখ্যা কমান হুকুমতের কাজ নহে। কিম্বা ব্যক্তিগত বা দলগত পক্ষপাতিত্ব করা হুকুমতের কাজ নহে। নিজের ব্যক্তিগত খামখেয়ালীমূলক মতের বশবর্তী হইয়া কোন কাজ করাও হুকুমতের কর্তব্য নহে। হুকুমতের কর্তব্য হইল—(১) বিশ্বমানবের শ্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত এবং তাঁহার খাছ রাসূলের মারফতে প্রচারিত যে সমস্ত বিধান কোরআন ও হাদীস শরীফে বিদ্যমান রহিয়াছে—তাহা লুকাইয়া না রাখিয়া এবং উহার শিক্ষা ও প্রচার বন্ধ না রাখিয়া; বরং সেই শিক্ষাকে যথাসাধ্য প্রচার করা ও চালু রাখা। (২) আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে যাবতীয় কায়িক বন্দেগী যথা নামায, রোযা প্রভৃতিকে চালু করা এবং যাহাতে গায়রুল্লাহর পূজা না হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা। (৩) তাঁহার আর্থিক বন্দেগী যাকাতকে চালু করিয়া ধনী লোকদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা এবং আল্লাহ তা'আলার শিক্ষা ও বিধান প্রচারের প্রাণীনগুলিকে সাহায্য করা। (৪) জনগণের মধ্যে সং কাজ, সুনীতি, ইসলামী আদর্শের চালচলন ও পারস্পরিক সহাবহার ও সদ্ভাব গড়িয়া তোলা। (৫) শরীঅত বিরুদ্ধ যাবতীয় কুকার, কুপ্রথা দুর্নীতি প্রভৃতি অসং কার্যগুলির মূল উৎপাটন করিয়া ফেলা। এই কাজগুলি ইসলামী হুকুমতের বুনিয়াদী কর্তব্য, এই কাজগুলির ভিতর দিয়াই মুসলিম জাতির পরানুকরণ প্রবণতা দূরীভূত হইয়া তাহাদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের ও ইসলামী প্রাবল্য কায়ম হইতে পারে। এই প্রেরণা শুধু হুকুমতের কাণ্ডারীগণের মনেই নহে; বরং সমস্ত মুসলিম সমাজের অন্তরে জাগরুক হওয়া একান্ত আবশ্যিক।

### ‘মুহাররাম’ ও ‘আশুরা’

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের তিন রকম সনের এবং তিন রকম মাসের হিসাবের বোঝা বহন করিতে হইতেছে। অথচ আমাদের দরকার আছে—মাত্র দুই রকম সনের এবং দুই রকমের মাসকে হিসাবে রাখার। (১) ইসলামী আহুকামের অধিকাংশই নির্ধারিত হইয়াছে চাঁদের হিসাবে। রমযান শরীফের রোযা ফরয করা হইয়াছে চাঁদের হিসাবে, যাকাত ফরয করা হইয়াছে চাঁদের হিসাবে। হজ্জ ফরয করা হইয়াছে চাঁদের হিসাবে, ছেলেমেয়ের বালেগ হওয়ার বয়স গণনা করা হয় চাঁদের হিসাবে, মেয়েলোকের ইদ্দত গণনা করা হয় চাঁদের হিসাবে। এইজন্য চাঁদের হিসাবে বৎসর ও মাসের হিসাব রাখার প্রয়োজন আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। পক্ষান্তরে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় নিরূপণ করা হয় সূর্যের হিসাবে, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতির তারিখ ও সময় নির্ণীত হয় সূর্যের হিসাবে। কাজেই চাঁদের মাস এবং সূর্যের মাসের হিসাব রাখাই আমাদের দরকার। সূর্যের সন বা মাসের হিসাবের জন্য দুইটি সনের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপান আছে।

একটিকে বলা হয় ঈসায়ী সন। হযরত ঈসা আলাইহিসসালাম একজন অতি মর্যাদাশীল পয়গম্বর বলিয়া আমরা মানি, কাজেই ঈসায়ী সন গ্রহণ করাতে আমাদের কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় আর একটি সন আমাদের ঘাড়ে চাপান আছে, সেটাকে বাংলা সন বলা হয়। ইহার পিছনে কোনই ঐতিহাসিক পটভূমিকা নাই। অধিকন্তু বাংলা মাসগুলির তারিখ ঠিক করাও জ্যোতিষী পণ্ডিতগণের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে জনসাধারণের পক্ষে উপায়ান্তর নাই। এমন কি, কোন কোন মাস ৩২ দিনেও হইয়া থাকে। তাহা কেমন করিয়া হয়, জ্যোতিষী পণ্ডিতগণের শরণাপন্ন না হইয়া তাহার কোন কারণই আমরা বলিতে পারি না। পক্ষান্তরে ঈসায়ী সনের মাসগুলির তারিখ নির্ধারিত আছে, সহজেই হিসাব রাখা যায়। আর চাঁদের মাসগুলির হিসাব সকলেই চোখে দেখিয়া এবং পূর্বমাসের হিসাব রাখিয়া ঠিক করিতে পারে। হিজরী সনের পিছনেই দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা বড় ত্যাগের ঐতিহাসিক পটভূমিকা রহিয়াছে।

বিশেষতঃ অন্যান্য ধর্মগুলির যেমন ব্যক্তিগত বা আঞ্চলিক বা বংশগত নামে নামকরণ করা হইয়াছে, ইসলাম ধর্মের নামকরণের বেলায় তেমন কোন ব্যক্তিগত বংশগত বা অঞ্চলগত নামে নামকৃত করা হয় নাই; বরং উহার সাধারণ গুণগত নামেই নামকরণ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে হিজরী সনকেও সত্যের জন্য ঘরবাড়ী, জায়গা-জমিন, বিষয়-সম্পত্তি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যথাসর্বস্ব ত্যাগরূপ মহৎ গুণের স্মৃতিমূলক নাম রাখা হইয়াছে। কোন ব্যক্তি-বিশেষের বা মৃত্যুর সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া নাম রাখা হয় নাই।

হিজরী সনের প্রথম মাস ‘মুহাররাম’। এই মাসের ১০ই রাত্রিকে আশুরার রাত্রি বলা হয়। এই দিনটির অনেক ফযীলত আছে। এই দিনে হযরত আদম আলাইহিসসালামের তওবা কবুল হয়। এই দিনে হযরত ইউনুস আলাইহিসসালামের কওমের তওবা কবুল হয়। এই দিনে হযরত নূহ আলাইহিসসালামের জাহাজ মহাপ্লাবন হইতে মুক্তি লাভপূর্বক জুদী পাহাড়ে আসিয়া লাগে। এই দিনে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিসসালাম জন্মলাভ করেন। এই দিনেই হযরত ঈসা আলাইহিসসালাম আল্লাহর অসীম কুদরতে বাপের ঔরস ব্যতীত মাতৃগর্ভ হইতে জন্মলাভ করেন। এই সমস্ত কারণে আশুরার রাত্রির ফযীলত অনেক বেশী। এই দিনে রোযা রাখিলে ও দান-খয়রাত করিলে অশেষ নেকী ও ছওয়াব পাওয়া যায়। ইহা পূর্ব হইতেই প্রমাণিত আছে।

পরে নানার উত্তরাধিকার বা রাজত্ব অধিকারের জন্য নহে; ইসলাম ধর্মের নেতৃত্ব কর্তৃত্বকে ইয়াযিদ ফাসেকের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য এবং মোসলেম জাতিকে ও ইসলামী আদর্শ ও খেলাফত-তন্ত্রকে সর্বপ্রধান বেদ’আত বংশগত রাজতন্ত্র হইতে রক্ষার জন্য আমাদের হযরতের নাতি ইমাম হোসায়েন (রাঃ) আমরণ জেহাদ করিয়া এই দিনেই শাহাদত বরণ করেন। অতএব, এই দিনে আমাদের কর্তব্য—রোযা রাখা, দান খয়রাত করা এবং আমাদের পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও আওলিয়াগণের ত্যাগের এবং আদর্শ চরিত্রের স্মৃতিকে স্মরণ করিয়া নিজেদের ভিতরে সেই প্রেরণা ও দ্বীনের খেদমতের জযবাকে জাগান। এই পবিত্র দিনকে তাজিয়া ইত্যাদি উৎসবের দ্বারা বা আরও অন্যান্য গর্হিত কর্মের দ্বারা অপবিত্র করা অতীব অন্যায়।

## ছফর মাস

ছফর মাসের শেষ বুধবারকে ‘আখেরী চাহার শম্ব’ বলা হয় এবং বলা হয় যে, ছফর মাসের শেষ বুধবার হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সুস্থ বোধ করিয়া গোসলে ছেহহাত লাভ

করিয়াছিলেন। এই স্বাস্থ্যগত উক্তির কোন প্রমাণ আমি এখনও পাই নাই। অবশ্য এতটুকু প্রমাণ পাইয়াছি যে, ২৮শে ছফর বুধবার হযরত প্রথম বিমার পড়িয়াছিলেন—বিমারীতে তিনি শেষ পর্যন্ত ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

### রবিউল আউয়াল শরীফ

এই পবিত্র মাসেই আমাদের হযরত আল্লাহর ওহীপ্রাপ্ত হইয়া আল্লাহর ওহীকৃত সমস্ত মানুষ পূজা, পুরোহিত পূজা, পীর পূজা, পয়গম্বর পূজা, রাজা-বাদশাহ পূজা, মূর্তিপূজা, মন পূজা, মনসা পূজা, কবর পূজা, জন্তু পূজা ইত্যাদি ইত্যাদি যাবতীয় গায়রুন্নাহর পূজা মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া পবিত্র আদর্শ অনুযায়ী একটি ভূখণ্ডকে পূর্ণ স্বাধীন নেযামে খেলাফত দান করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের কর্তব্য অন্ততঃ এই মাসটাকে আমরা হযরতের পূর্ণ জীবন-চরিত আলোচনায় এবং হযরতের জীবনের পবিত্র আদর্শ গবেষণায় কাটাই এবং আমরা যাতে তাঁহার কূলের কুলাঙ্গার না হই, সেই চেষ্টায় আমরা আজীবন লিপ্ত থাকার শপথকে প্রতি বৎসর নূতন করিয়া করি। মশহুর কথা এই যে, ১২ই রবিউল আউয়ালই হযরতের পয়দায়েশের তারিখও এবং এই তারিখ ওফাতের তারিখও। কিন্তু আলোচনার জন্য এই তারিখকেই সীমাবদ্ধভাবে নির্ধারিত করার কোন মানে নাই।

### রবিউস্সানি

এই মাসের ১১ই তারিখে বিশ্ব-বিখ্যাত বড় পীর ছাহেব হযরত আবদুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ্ আলাইহি ইহধাম ত্যাগ করেন। অবতারবাদ হিন্দুদের মিথ্যা মতবাদ, ইসলামে উহার কোন স্থান নাই। অজ্ঞতাবশতঃ বা হিন্দু পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে কেহ কেহ আল্লাহর ওলী সুলতানুল নিন্দ খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী রহমতুল্লাহ্ আলাইহির মাযার আযমীর শরীফকে তীর্থস্থান মনে করে বা তাঁহাকে হাজত-রওয়া মনে করিয়া তাঁহার নিকট হাজত চায়; মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী, বিপদ হরণকারী, সম্পদ দানকারী মনে করিয়া তাঁহার কাছে প্রার্থনা করে—ইহা মারাত্মক ভুল শেরেকী আকীদা। হাজত-রওয়া, মনোবাঞ্ছা পূর্ণকারী, বিপদ হরণকারী, সম্পদ দানকারী এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ নাই।

হযরত বড় পীর ছাহেব সম্পর্কে অবতারবাদের ভুল ধারণা মনে পোষণ করিয়া يا خواجه عبد القادر جيلانى شيناي الله এর যপনা করিয়া ওযীফা পড়িয়া শেরেকী পাপে নিমগ্ন হয়। এহেন ভুল আকীদা বা সুলতনের বরখেলাফ কোন কার্যক্রম হইতে পরহেয থাকিয়া এসব বুয়ুর্গানে দীন, আউলিয়ায়ে কেরাম কিরূপ সাধনা করিয়া এত বড় বুয়ুর্গ হইলেন এবং তাহারা ইসলামের খেদ-মতের জন্য কতভাবে জীবন কোরবান করিয়াছেন, সেইসব আদর্শ আমাদের স্মরণ করা দরকার। জীবনকে সেই আদর্শ অনুসারে গঠন করার চেষ্টা করা দরকার।

### রজব শরীফ

রজব মাসে আমাদের হযরতের মে'রাজ হইয়াছিল। মে'রাজ শরীফের অর্থ এই যে, ইসলাম ধর্মের ভিত্তি আল্লাহ্ একজন আছেন। আল্লাহর বিচার সত্য। কর্মফল নেকী-বদীর ফলাফলের জন্য একটা দিন ধার্য আছে, উহাকে আখেরাত বলে। ইহা সত্য। আল্লাহর রাসূল সত্য, এই তিনটি বিশ্বাসের উপরই ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি স্থাপিত। এখন প্রশ্ন এই আসে যে, এই তিনটি বিশ্বাস



কি অন্ধ বিশ্বাস, না কাল্পনিক যুক্তিভিত্তিক বিশ্বাস, না বাস্তব চাক্ষুষ দেখা বিশ্বাস? উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের হযরতকে সপ্ত আকাশের উর্ধ্ব আকাশের উপর পর্যন্ত সশরীরে তুলিয়া নিয়া সবকিছু দেখাইয়া দিয়াছেন। বেহেশত, দোযখ, আরশ, কুরসী, লওহ, কলম, কোন্ পাপের কি শাস্তি, কোন্ নেকীর কি পুরস্কার, এমনকি স্বয়ং আল্লাহ্কে পর্যন্ত আমাদের হযরত (দঃ) চাক্ষুষ দেখিয়া আসিয়াছেন। এমনভাবে দেখিয়াছেন যে, কোরআন শরীফ সাক্ষ্য দিতেছে—

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى যে দেখার মধ্যে এক বিন্দুও ব্যতিক্রম বা অতিক্রম হয় নাই। এই চাক্ষুষ দর্শনের নামই মে'রাজ শরীফ। এইরূপ মজবুত ভিত্তির উপর স্থাপিত ইসলাম ধর্মের ভিত্তি।

মে'রাজ শরীফকে যাহারা বিশ্বাস না করে, তাহাদের ঈমানের ভিত্তিই নড়বড়ে, টলমল। অতএব, প্রত্যেক বৎসর মে'রাজ শরীফের আলোচনা নূতনভাবে করিয়া প্রত্যেক মুসলমানেরই ঈমানকে তাজা করা দরকার।

মশ্হুর কথা হইল— রজবের ২৭শে মে'রাজ শরীফ হইয়াছিল। মে'রাজ শরীফ ছাড়াও রজব মাসের মর্তবা আছে। বার মাসের মধ্যে চারিটি মাস অধিক মর্যাদার মাস, অর্থাৎ—‘আশহোরে হোরম’ যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহাররাম এবং রজব। অন্যান্য মাসের চেয়ে এই চারি মাসের মর্যাদা বেশী। অতএব, এই চারি মাস নফল রোযা, নফল নামায, নফল দান-খয়রাত করিলে ছওয়াব বেশী হয় এবং গোনাহর কাজ করিলেও গোনাহ বেশী হয়।

### শা'বান—শবে বরাত'

শা'বান মাসের ১৫ই রাত্রে শবে বরাত। প্রকাশ থাকে যে, আমাদের ইসলামী শরীঅত অনুযায়ী রাত্রিকে আগে ও দিনকে পরে ধরা হয়। অতএব, ১৫ই রাত্রি বলিতে ১৪ই দিবাগত রাত্রি বুঝায়। এই রাত্রি একটি অতি মহান রাত্রি। এই রাত্রে রাত্রি জাগরণ করিয়া এবাদত বন্দেগী—নফল নামায, কোরআন তেলাওয়াত, দুর্গদ শরীফ পাঠ, সমস্ত গোনাহর কাজ হইতে তওবা এস্তেগফার করা, আল্লাহর যিক্র করা দরকার এবং আপোষে হিংসা-বিদ্বেষ, মনোমালিন্য কাহারও সঙ্গে থাকিলে তাহা দূর করা দরকার। মৃত মা-বাপ, ওস্তাদ, গরীব আত্মীয়-স্বজন সকল মোমেনীন, মোমেনাত, মোসলেমীন, ও মোসলেমাতের জন্য ছওয়াব-রেসানী, কবর যিয়ারত যার যেমন তওফীক হয়, করা দরকার। তারপর দিনের বেলায় রোযা রাখা দরকার।

আগামী এক বৎসরের হায়াত, মউত, রিয়ক, দৌলত ইত্যাদি সম্পর্কীয় তকদীর ও কিসমত এই রাত্রিতে আল্লাহর তরফ হইতে লিখিত হইয়া ফেরেশতাদের হাওলা করা হয়।

এই রাত্রিতে কোন কোন অঞ্চলে আতশবাজীর প্রথা আছে, ইহা খারাব প্রথা। এই খারাব প্রথা বর্জন করা দরকার। গরীবদের দান করিবার জন্য এবং নিজেদের খাওয়ার জন্য যার তওফীক হয় (চুরি না করিয়া, ঋণ না করিয়া, ভিক্ষা না করিয়া) হালুয়ারুটি পাকান কোন পাপের কাজ নহে। অবশ্য ইহাকে শরীঅতের অঙ্গ মনে করা ভুল।

### রমযান

রমযান শরীফের পূর্ণ একমাসের রোযা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। যে রাত্রিতে প্রথম চাঁদ দেখা যায়, সেই রাত্রি হইতে পুনরায় যে রাত্রিতে ঈদের চাঁদ দেখা যাইবে সেই রাত্রি না আসা পর্যন্ত প্রত্যেক রাত্রে এশার ফরয ও সুন্নত নামাযের পর দুই দুই রাক'আত করিয়া